কঠিন পদার্থের কথা

ডঃ এ, কে, এম, আজহারুল ইসলাম

কঠিন পদার্থের কথা

"... আর আসমানসমূহ ও ভূ-পৃষ্ঠে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে সে সমস্তকে তিনি তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করেছেন ; নিঃসন্দেহে এগুলির মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে।"

আল-কোরআন [৪৫:১৩]

কঠিন পদার্থের কথা

এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

BANSDOC Library
Accession No. 18447
Date 10-6-97

বা/এ ২৯৩২

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯০, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। পাণ্ডুলিপি : ভাষা ও সাহিত্য-উপবিভাগ। প্রকাশক : ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ। বাংলা একাডমী, ঢাকা-১০০০। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০০/ জানুয়ারি ১৯৯৪। প্রকাশক : মুহম্মদ নূরুল হুদা। পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণ : কাশবন মুদ্রায়ণ, ১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা-১১০০। চিত্র অঙ্কন : এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম। মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০। মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা।

KATHIN PADARTHER KATHA (On Solids) by Dr. A.K.M. Azharul Islam. Published by Bangla Academy. Dhaka, Bangladesh. First Edition February 1984. First Reprint January 1994. Price : TK. 70.00

ISBN 984-07-2941-1

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতোপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোনো প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন্ বই বেশি পাঠকনন্দিত, কোন্ বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণ কাজটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাকার বিষয় ত্বরান্বিত হবে বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

পুনর্মুদ্রণ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থসহ পাঠকনন্দিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। যাঁদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাঁদের উপকারে আসলে বাংলা একাডেমী শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবে।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

BANGDOO Library Dhaka

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বেশ আগেই নিঃশেষিত হয়েছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও নানান কারণে সময়মত এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হয় নি। ইতোমধ্যে বিজ্ঞান জগতের অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা কিনা এ ধরনের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। অতএব কিছু নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ করে কিশোর বিজ্ঞানীদের কৌতূহল মেটানোর জন্য বর্ধিত কলেবরে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের অবতারণা। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পাণ্ডুলিপিটি ১৯৯০ এর মে মাসে বাংলা একাডেমীতে জমা দেয়া হয়। গ্রন্থটি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করার কথা থাকলেও বাংলা একাডেমীর আর্থিক অনটন ও অন্যবিধ প্রতিকূলতার কারণে এর প্রকাশনা পিছাতে পিছাতে আরো তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তা' সত্ত্বেও গ্রন্থটির উপযোগিতা কোনো রকমেই হ্রাস পায় নি বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রকাশনায় অহেতুক বিলম্বের কারণে পুনরায় ১৯৯৩ এর জানুয়ারিতে গ্রন্থটিতে অতিরিক্ত আরো কিছু বিষয় সংযোজিত হয়েছে।

প্রথম সংস্করণের চিত্রগুলি পরিমার্জনাসহ নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সেই সাথে কিছু অতিরিক্ত চিত্রও সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নতুন তথ্য সমৃদ্ধ বর্ধিত কলেবরের গ্রন্থটি কিশোরেরা আগের মতোই সাদরে গ্রহণ করবে বলে আশা করছি।

এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই, ১৯৯৩

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে 'সলিড স্টেট ফিজিক্স' বা কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে, এর বহু প্রয়োগ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এ সকল গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও উৎসাহী কিশোর-কিশোরীদের নিকট বিজ্ঞানের এ শাখা আজও বেশ অপরিচিত। এমন একটি দ্রুত অগ্রসরমান জ্ঞানের প্রসারকে জনপ্রিয় করে তোলার মতো কোনো গ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষায় আজও প্রকাশ পায় নি।

আমাদের মাঝে বিজ্ঞানের এ শাখা সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার হউক — এ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে এই গ্রন্থ লেখার কাজে হাত দিয়েছিলাম। এটি কোনো 'টেকস্ট বুক' বা পাঠ্যপুস্তক নয় বরং বিষয়ের উপর সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত চিত্তাকর্ষক মৌলিক গ্রন্থ। 'কিশোর বিজ্ঞান সিরিজের জন্য কঠিন পদার্থের কথা'র বিষয়বস্তু যথাযথ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত হলে যে জটিল হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই দুরূহ হলেও কিশোর বিজ্ঞানী ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপযোগী করার জন্য জটিল বিষয়বস্তুকে যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষায় লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য শুধুমাত্র ভাসা ভাসা প্রাথমিক তথ্য দিয়ে যে সরস বিজ্ঞান চর্চা আমাদের দেশে করা হয় মাঝে মাঝে প্রয়োজনের খাতিরে তা থেকে সামান্য কিছু গভীরে পা বাড়ানো হয়েছে।

কঠিন পদার্থ ও কেলাসের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে গেলে তাদের ধর্ম ও নানাবিধ গুণাগুণ সম্পর্কে ভাল পরিচয় থাকা দরকার। একই কার্বনের দুই রূপ — হীরক আর গ্রাফাইট ; অথচ এদের গুণাগুণের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কেন? এর উত্তর সহজে ও সংক্ষেপে দেবার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। হীরকের কাঠিন্য ও বিদারণ গুণ — নিরস জিনিস। তাই এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ভরি ওজনের ও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হীরকখণ্ড 'কুলিনান' এর গল্পের অবতারণা করতে হয়েছে — যাতে করে বস্তুর বিভিন্ন ধর্মের বিবরণের মতো এই গল্প শিক্ষণীয় ও চমকপ্রদ হয়। শুধু এখানেই নয় — গ্রন্থের আরো বহু জায়গায় বিজ্ঞানের জরুরি বহু জটিল তত্ত্ব ও তথ্য যথাসম্ভব সহজ ভাষায় দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে, যাতে কঠিন পদার্থের গুণাবলী সম্পর্কে জানার সাথে সাথে এগুলি পড়ে কিশোরেরা যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের স্বভাবজাত ঔৎসুক্য এবং অনুসন্ধিৎসার কাছে 'কঠিন পদার্থের কথা' বইটি তাদের চিন্তারাজ্যে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করতে পারবে বলে আশা করি।

আধুনিক যুগের বিস্ময়কর ও অভিভূতকারী বিষয় হচ্ছে 'মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স'। কঠিন আকৃতির ইলেট্রনিক উপাদানের বিভিন্ন দিকের সাথে সাথে এই বিচিত্র রহস্যময় জগতের কিছু সন্ধান এ ছোট্ট বইতে দেওয়া হয়েছে। এতে করে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কিশোর বিজ্ঞানীরা নানান ধরনের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার একটি সহজ সরল উত্তর পাবে — এটা স্বভাবতই আশা করা যায়।

পরিশেষে এই বই লেখার ব্যাপারে যাঁদের উৎসাহ এবং সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে ডঃ নুরুল ইসলাম, ডঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, ডঃ আব্দুস সালাম মণ্ডল, ডঃ সাইদুর রহমান খান, জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ও স্নেহের ভাগিনা এ.টি.এম. মুজাহিদুল ইসলাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য — এঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৮

সূচিপত্র

ভূমিকা	**পাঁচ**
এক — নবযুগ	১
দুই — পদার্থ ও পরমাণু বার্তা	৫
তিন — কঠিন পদার্থের গঠনভঙ্গি	১৩
চার — কঠিন পদার্থের গুণাবলী	২৪
পাঁচ — কেলাসের ব্যবহার	৪৬
ছয় — অর্ধপরিবাহীর বিচিত্র কথা	৬০
সাত — ট্রানজিস্টার জগৎ	৮৪
আট — মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স রহস্য	৯৪
নয় — সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ	১০৪
পরিশিষ্ট	১১০
পরিভাষা	১১৭

এক

নবযুগ

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে লী ডি ফরেস্ট নামে একজন আমেরিকান ট্রায়োড ভাল্‌ভ আবিষ্কার করেন। আর এই একটি মাত্র আবিষ্কারের ফলে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান টেলিভিশন, রাডার ও আরো বহু ধরনের নতুন সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এই ভাল্‌ভ উন্নতির প্রথম পঞ্চাশ বছরে তার প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখে, কিন্তু ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ট্রানজিস্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অথচ সহজ সরল সরঞ্জাম আবিষ্কারের ফলে এর প্রাধান্য মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'সলিড স্টেট' বা কঠিন আকৃতির ইলেকট্রনিক উপাদানের আবিষ্কার ও তার ক্রমোন্নতির ফলে ইলেকট্রনিক কলা-কৌশল ব্যবহারের পরিধি অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কঠিন আকৃতির ইলেকট্রনিক উপাদানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে ব্যবহৃত নতুন নতুন সরঞ্জামের পরিকল্পনা দারুণভাবে সরল ও সহজ করা সম্ভব হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, বর্তমানে ইলেকট্রনিক জগতে যে বিপ্লব চলছে তা অদূর ভবিষ্যতে আরো ত্বরান্বিত হবে।

আজ মানুষ জয় করেছে মহাশূন্য — চাঁদে সে পাড়ি দিয়েছে, মঙ্গলগ্রহেও মহাশূন্যযান ভাইকিং পাঠানো হয়েছে। বহু কলকারখায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আজ প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে। মহাশূন্যযান ভাইকিং-এ বহু ধরনের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও ডিটেক্টর দরকার আর এসব জটিল সাজ সরঞ্জামের আকার, আয়তন ও ওজন খুবই কম হতে হয়। কারণ মহাশূন্যযানের অতি অল্প জায়গার মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। আর এ জন্যে প্রচেষ্টা চলছে অতি ক্ষুদ্রাকৃতির সব ধরনের ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জাম তৈরির। বিজ্ঞানীরা এসব সাজ-সরঞ্জাম ক্ষুদ্রীকরণের জন্য 'মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স' আবিষ্কার করেন। এ ধরনের সরঞ্জামে অতি ক্ষুদ্রাকার বর্তনী থাকে

যাকে বলা হয় 'মাইক্রো-সার্কিট' —এই বর্তনীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে চেনা যায় না। এর ফলে বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের আকার আয়তন এত ক্ষুদ্র হয়েছে যে রেডিও, টেলিভিশন এমনকি কম্পিউটারেরও পকেট সংস্করণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। একান্ত ব্যক্তিগতভাবে টেলিভিশন সেট চশমার আকারে চোখে লাগিয়ে ব্যবহারের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে — ১৯৭৭ এর প্রথম দিকেই এক বৃটিশ কোম্পানি মাত্র দুই ইঞ্চি পর্দার এক টেলিভিশন সেট বাজারে ছেড়েছে ; এই পকেট সংস্করণ দিয়েও অতি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় এবং স্পষ্ট কথাবার্তাও শোনা যায়।

আজকাল ডাক্তারেরা ছোট্ট রেডিও ট্রান্সমিটার, ক্যাপসুলের মধ্যে পুরে রোগীকে খাওয়ান এবং রোগীর দেহের ভিতরের দরকারি তথ্যাদি জেনে নেন। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ পাখি, মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ট্রান্সমিটার সংযুক্ত করে এদের গতিবিধি লক্ষ্য ও অন্যান্য সমীক্ষা অনায়াসে পরিচালনা করছেন। সমুদ্রে তেল অনুসন্ধানের জন্যে তৈরি একটি বিশেষ ধরনের সাঙ্কেতিক বাতি দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের একটি কারখানায় পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। উত্তর সাগরের তেল ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহারের জন্যে এতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে। বাতিটিতে যে ধরনের উপাদান রয়েছে তাতে পৃথিবীর যে-কোন আবহাওয়ায় একে কাজে লাগানো যাবে। 'এতে ল্যাম্পচেঞ্জার' এবং 'কুলিংফ্যানের' মতো পরিবর্তনশীল অংশের পরিবর্তে কঠিন আকৃতির ইলেকট্রনিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

আবার এর ফলে দশ পনেরো বছর আগের উদ্ভাবিত সূক্ষ্মযন্ত্র বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির যুগেও অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন অতিক্ষুদ্র এক আধুনিক কম্পিউটার তার পূর্ব সংস্করণের চেয়ে ছয় গুণ বা ততোধিক শক্তিশালী অথচ দামে সস্তা — দশ বছরের আগের তুলনায় তা মাত্র এক চতুর্থাংশ বা তারও কম দামে বাজারে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল ইক্যুইপমেন্ট কোম্পানির পিডিপি-৮ কম্পিউটারের দাম ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ছয় হাজার পাউণ্ড ছিল—এই দাম কমে গিয়ে ১৯৭৬ এর দিকে মাত্র বারো শ' পাউণ্ড হয়েছে। বর্তমানে তা আরো অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া আজকাল অনেক শক্তিশালী কম্পিউটারও তিনশ' পাউণ্ড বা তারও কমে বাজারে পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগ 'সলিডস্টেট ইলেকট্রনিক্সের' যুগ। এর কলা-কৌশল ব্যবহারের পরিধি যে অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা রেডিও, টেলিভিশন, রাডার (গ্রাহক বর্তনী), ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার (বর্তনী) এবং কল-কারখানা নিয়ন্ত্রণের কাজে কঠিন আকৃতির উপাদান ব্যবহারের মাত্রা থেকেই বুঝা যায়। এ ছাড়া ডিসি থেকে এসি শক্তির রূপান্তর, রাডার পাল্‌স মডুলেশন, ভ্রাম্যমাণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন আকৃতির ইলেকট্রনিক উপাদান ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি ও অধিক ক্ষমতার রেডিও, রাডার, টেলিভিশন ও দূরবর্তী টেলিফোন প্রেরণ ব্যবস্থার সর্বশেষ অংশ, ভ্রাম্যমাণ যোগাযোগ, কলকারখানা নিয়ন্ত্রণে ও কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে আজো ভাল্‌ভ ব্যবহৃত হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভাল্‌ভের প্রাধান্য আজকাল শুধুমাত্র বেশি ক্ষমতার সাজ-সরঞ্জাম ও উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বেলায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাল্‌ভের প্রাধান্য ক্ষুন্নকারী কঠিন আকৃতির ইলেকট্রনিক উপাদান মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে তার স্থান দখল করে নিয়েছে। তাই আমাদের জীবনের ছোট বড় প্রয়োজন মেটানো থেকে শুরু করে মহাশূন্যে অভিযান, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে যাত্রার সব কিছুতেই এই সলিডস্টেট বা কঠিন আকৃতির ইলেকট্রনিক সরঞ্জামাদির অবদান অনস্বীকার্য।

বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আজকাল কেলাসিত ও অদানাদার উভয় অবস্থায় কঠিন পদার্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ছোট খাট জিনিস থেকে শুরু করে কেলাস ঘড়ি, রুবী লেজার অর্থপরিবাহী সাজ-সরঞ্জাম, সৌর বিদ্যুৎকোষ, অর্ধপরিবাহী লেজার প্রভৃতির সুফল আমরা ভোগ করছি। এছাড়া নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় : এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিপরিবাহিতা প্রয়োগ করার বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এগুলি সম্ভব হলে আধুনিক প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। কাজেই কঠিন পদার্থের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ, কঠিন আকৃতির ইলেকট্রনিক উপাদানের নানাবিধ আবিষ্কার ও তার নব নব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলেই আজ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে ও ভবিষ্যতে আরো হবে।

বিজ্ঞানের এই শাখা অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে আমাদের এই জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। অধুনা বিদেশে জীবনযাত্রার মান কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে

তার ধারনা একটি আধুনিক বাসগৃহে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে (চিত্র ১.১)। কঠিন আকৃতির পদার্থের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার সত্যিই আধুনিক জীবনযাত্রায় চমক এনেছে। কিন্তু তা সত্বেও কি আমরা কঠিন পদার্থের অসাধারণ গুরুত্বের কথা কখনো তেমন গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছি?

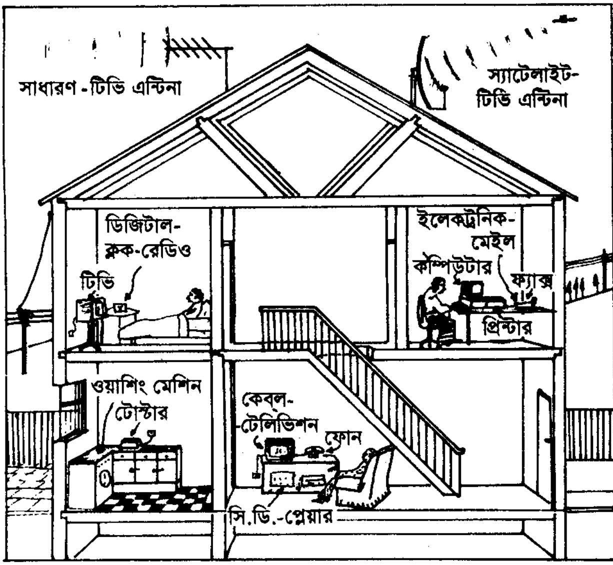

[চিত্র ১·১ একটি আধুনিক বাসগৃহ]

কঠিন পদার্থের এই বিস্ময়কর অবদান কিভাবে সম্ভবপর হলো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রাদি কিভাবে তৈরি হলো তা জানতে আমরা অনেক সময়ই আগ্রহী হয়ে উঠি। আর এ অনুসন্ধিৎসু মনের হাজারো প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে।

দুই

পদার্থ ও পরমাণু বার্তা

আমরা রেগে গেলে সহসাই কাউকে অপদার্থ বলে বকা দেই। আসলে অপদার্থ বলতে এ দুনিয়ায় কিছু নেই। বিজ্ঞানের কারবারই হচ্ছে পদার্থ নিয়ে। কাজেই বিজ্ঞানের ভাষায় অপদার্থ বলে কোন কথা নেই—থাকতে পারে না। এই যে যাকে বকা দিয়ে অপদার্থ বলা হলো সেও কিন্তু পদার্থ দিয়েই গঠিত। এই দুনিয়ার সব কিছুই পদার্থ দিয়ে তৈরি। মাটি, পাথর, লোহা, সোনা, ইট, কাঠ, তুলা, আলো, পানি, বাতাস বলে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছুই পদার্থ।

পদার্থ বিজ্ঞান উল্লিখিত বস্তু ছাড়াও আরো অনেক কিছু আমাদের জানিয়ে দেয়। প্রকৃতিতে জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। ফলে গড়ে উঠেছে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যাসহ আরো বহুবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা। রসায়নবিদরা পদার্থের গঠন, ধর্ম এবং তাদের বিভিন্ন পরিবর্তন সক্রান্ত নানারকম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান।

পদার্থ কত রকম?

দুনিয়ার তাবৎ জিনিষ যে পদার্থ নিয়ে গঠিত সেসব পদার্থ সম্পর্কে আরো কিছু ভাবা যাক। পদার্থকে নানা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কঠিন, তরল আর বায়বীয়-পদার্থের এই তিন অবস্থার কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি। সাধারণ অবস্থায় কোন পদার্থ কঠিন অবস্থায়, কোন পদার্থ তরল অবস্থায় আবার কোন কোন পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় থাকে। কঠিন, তরল, বায়বীয় যে পদার্থই হোক না কেন তারা কিছু না কিছু স্থান দখল করে থাকে এবং সব পদার্থেরই ভর আছে। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের আশেপাশের সব বস্তুই নানারূপ পদার্থ দিয়ে গঠিত। আবার প্রত্যেক পদার্থই তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি।

প্রকৃতিতে সমস্ত পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) মৌলিক পদার্থ ও (২) যৌগিক পদার্থ। এ উভয় প্রকার পদার্থই অণু, পরমাণু আর মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত।

১. **মৌলিক পদার্থ** ঃ এক বা একাধিক মৌলিক বস্তু দ্বারা যে সব পদার্থ গঠিত তাদেরকে মৌলিক পদার্থ বলে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ১০৬টি মৌলিক পদার্থের কথা আমরা জেনেছি। এ ছাড়া বাকি সব পদার্থই যৌগিক। তামা, লোহা, দস্তা, এলুমিনিয়াম, সোনা প্রভৃতি ধাতব মৌলিক পদার্থ আর অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, সালফার প্রভৃতি অধাতব মৌলিক পদার্থ।

২. **যৌগিক পদার্থ** ঃ একাধিক রকমের মৌলিক পদার্থ মিলে যৌগিক পদার্থ গঠিত হয়। এ সমস্ত পদার্থের গুণাগুণ মৌলিক পদার্থের গুণাগুণ থেকে আলাদা। মৌলিক পদার্থগুলিই আসল একক পদার্থ আর নির্দিষ্ট সংখ্যায় ও নিয়মে এদের সম্মিলনের ফলেই যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। দু'ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মিলে পানি তৈরি হয়। পানি হচ্ছে যৌগিক পদার্থ। পানির গুণাগুণের সাথে, পানির মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের গুণাগুণের কোন মিল নেই।

অণু

অণু হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ —এগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের নিজস্ব ধর্মাবলী বজায় রাখতে এবং আদি বস্তুর সকল গুণ প্রকাশ করতে পারে।

মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ উভয়েই এরূপ অসংখ্য অণুর সমন্বয়ে গঠিত। একটি দালান তৈরি করতে যেমন ইটের উপর ইটের গাঁথুনী দিতে হয় ঠিক তেমনি বহু অণুর সমন্বয়ে পদার্থ গঠিত হয়। অণুর ইংরেজি নাম মলিকিউল (molecule)।

পানি যৌগিক পদার্থ। এক ফোঁটা পানিকে যদি ক্রমান্বয়ে ভাগ করে অবশেষে সম্ভাব্য এমন ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় যা' পানিই থাকবে, তা'হলে ঐ ক্ষুদ্র অংশই হবে পানির অণু। এই অণুকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু অধুনা 'ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ' যন্ত্রের সাহায্যে

পানির অণুর চেয়ে বহুগুণে বড় প্রোটিনের অণুর ছবি দেখা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এই যন্ত্রে কোন জিনিসকে তার আসল অবস্থার চেয়ে বহুগুণ বড় দেখা যায়।

পরমাণু

পদার্থের অণুগুলি আবার আরো ক্ষুদ্রতর অংশ 'পরমাণু'র সমবায়ে গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুগুলি একাধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে এক একটি অণু গঠন করে।

পরমাণুকে ইংরেজিতে অ্যাটম (Atom) বলা হয়। অ্যাটমের মূল শব্দ হচ্ছে গ্রীক। গ্রীক ভাষায় A-এর অর্থ হচ্ছে 'না' আর tomos হচ্ছে যাকে কাটা বা ভাঙা যায় না অর্থাৎ অবিভাজ্য। 'বস্তুর অন্তিম সত্তার ধারক ও বাহক পরমাণু অবিভাজ্য'– এই ধারণা অতি পুরাতন। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীস দেশের ডিমোক্রিটাস নামে একজন বড় পণ্ডিত এই ধারণা দেন যে, 'বস্তু অদৃশ্য, অবিভাজ্য কণার সমষ্টি মাত্র।' তাঁর তত্ত্বের ব্যবহারিক ভিত্তি না থাকলেও এই সূত্র ধরেই বিজ্ঞানীদের ধ্যান ধারণা এগিয়ে চললো। তারপর প্রায় সাড়ে বাইশ'শ বছর পরে (১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে) জন ডালটন নামে ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেষ্টার শহরের এক রসায়নবিদ স্কুল শিক্ষক পরমাণু সম্বন্ধে এক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত তত্ত্বটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ — শুধু বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়াতেই এগুলির অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

(খ) যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি অবিকল এক রকম। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের জন্যেই নির্দিষ্ট এক প্রকার পরমাণু আছে। যতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে ঠিক তত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুও আছে।

(গ) বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজনও আলাদা। যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ষোলগুণ বেশি।

(ঘ) পরমাণুর কারসাজিতেই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে থাকে। পরমাণুগুলির দল ত্যাগ (অণুর ভাঙ্গন) আর নতুন দল গঠনের (নতুন অণু গঠন) ব্যাপারই রাসায়নিক ক্রিয়ার আসল কথা।

সব বস্তুই এক বা একাধিক প্রকারের পরমাণু সহযোগে গঠিত। অক্ষর সাজিয়ে যেমন হাজার হাজার শব্দ গঠন করা যায় তেমনি উপযুক্ত পরমাণু সহযোগে রাসায়নিক পদ্ধতিতেও অসংখ্য পদার্থ তৈরি করা সম্ভব।

বিভিন্ন পদার্থের গুণাগুণ পরমাণুগুলির বৈসাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণত সাধারণ লবণ—সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরমাণুর সংযোগে গঠিত। লবণের স্বাদ যে লোনা তা' সবাই জানে, কিন্তু সোডিয়াম বা ক্লোরিন পরমাণু কারুরই এমন লোনা গুণ নেই—শুধু বিশিষ্ট ভঙ্গিতে তারা সংযুক্ত হলেই এই গুণ প্রাপ্ত হয়।

এবার পরমাণুর আকার আয়তন সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাক। পরমাণু খুবই ক্ষুদ্র। সবচেয়ে ছোট, হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ প্রায় $১০^{-৮}$ সে.মি.। এক ফোঁটা পানিতে অসংখ্য পরমাণু রয়েছে। এই সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে মনে করা যাক, বাংলাদেশের সাড়ে দশ কোটি লোককে পরমাণু গণনার কাজে লাগানো হলো। প্রতিটি লোককে প্রতি সেকেণ্ডে দু'টি করে গণনা করতে বলা হলো। তাঁরা যদি এক মুহূর্তও বিশ্রাম না নিয়ে সারা দিন-রাত কাজ করেন তবে এক ফোঁটা পানির পরমাণু সংখ্যা গণনা করতে সময় লাগবে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর। ক্ষুদ্র এক ফোঁটা পানির পরমাণু সংখ্যা গুণতে যখন এত সময় লাগছে তখন একটি পরমাণু সম্বন্ধে অনুমান করাটা নিতান্তই কষ্টসাধ্য এবং দুরূহ ব্যাপার বৈকি।

আকারে পরমাণুগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, এদেরকে খালি চোখে তো নয়ই, এমনকি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা সম্ভব নয়। তা'হলে বিজ্ঞানীরা কিভাবে এসব তথ্য সংগ্রহ করলেন? এক্স-রশ্মি বা ইলেকট্রন তরঙ্গ দিয়ে জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানা সম্ভব। তবে উচ্চতর বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরো বেশি জানা শোনা না হলে এসব পরীক্ষার জটিল তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন।

পরমাণুর গঠন

বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন জটিল পরীক্ষার মাধ্যমে পরমাণু সম্বন্ধে আরও যুগান্তকারী তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 'বস্তুর শেষ সত্তার ধারক ও বাহক অবিভাজ্য'—এ তত্ত্ব আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

পরমাণুর ভিতরের রহস্য বহুদিন ধরে মানুষের কাছে অজানা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আস্তে আস্তে পরমাণুর আবরণ ভেদ করে তার ভিতরকার ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, পদার্থের পরমাণু থেকে মাঝে মাঝে আস্ত বস্তু-কণা বের হয়ে আসে। পরমাণু হতে আবিষ্কৃত সর্বপ্রথম কণিকা 'ইলেকট্রন'। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক জে. জে. টমসন সর্বপ্রথম এই ইলেকট্রন কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। আরো নানা রকমের পরীক্ষার সাহায্যে এটা প্রমাণিত হয় যে, সব ধরনের বস্তুতে একই ধর্ম সম্পন্ন নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট এই কণা বিদ্যমান। ডক্টর জনস্টোন স্টোনির প্রস্তাব অনুসারে সকল পদার্থের এই উপাদানের নাম রাখা হয় ইলেকট্রন। পরীক্ষার মাধ্যমে আরো জানা গেছে যে ইলেকট্রন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে প্রায় ১৮৪০ গুণ হালকা।

কতকগুলি পরমাণু মিলে যেমন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি কতকগুলি কণিকার সমষ্টিতে সৃষ্টি হয় পরমাণু। এই কণিকাগুলি হলো ঃ ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। ইলেকট্রনের চার্জ হলো নেগেটিভ, প্রোটনের চার্জ পজিটিভ আর নিউট্রনগুলি চার্জবিহীন। এখানে মনে রাখা দরকার প্রতি ইলেকট্রনে যে পরিমাণ চার্জ আছে, প্রতি প্রোটনেও ঠিক সেই পরিমাণ চার্জ আছে। আর পরমাণুতে সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে।

পরমাণুর প্রধান অংশ হলো এর কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের আয়তন পরমাণুর আয়তনের চাইতে প্রায় দশ হাজার গুণ ছোট হলেও পরমাণুর সমস্ত ভরই নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত থাকে। এক বা একাধিক ইলেকট্রন এই পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসের চারদিকে অনবরত ঘোরে। এই হিসেবে পরমাণুর গঠনকে সৌর-জগতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রহগুলি যেমন অনবরত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে তেমনিভাবে ইলেকট্রন কণা বা কণাসমূহও নিউক্লিয়াসের চারদিকে অনবরত ঘুরছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পনেরশ' মাইল বেগে ঘুরছে। এই বেগ আমাদের দেশের দ্রুতগামী যে কোনে ট্রেনের তুলনায় প্রায় নব্বই হাজার গুণ বেশি।

নিউক্লিয়াসের পজিটিভ ও ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের মধ্যে সর্বদা এক বৈদ্যুতিক আকর্ষণ থাকে। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের প্রোটনের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব থাকলেও তাদের বৈদ্যুতিক আকর্ষণের তুলনায় তা' অতি নগণ্য। এই বৈদ্যুতিক আকর্ষণের জন্যই ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে বিশেষ এক কক্ষপথে অনবরত ঘুরে চলেছে।

হাইড্রোজেন পরমাণু হতে এর একমাত্র ইলেকট্রনকে সরিয়ে নিলে এই পরমাণুতে যা অবশিষ্ট থাকে সেটি হলো প্রোটন। অর্থাৎ প্রোটন হলো হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস। হাইড্রোজেন ছাড়া আর সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস প্রোটন আর নিউট্রন নিয়ে গঠিত। নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান। পরমাণু সব সময় বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ ; সুতরাং কোন পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সব সময় সমান। এই নিয়মের কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই ; কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান বা বেশি হতে পারে।

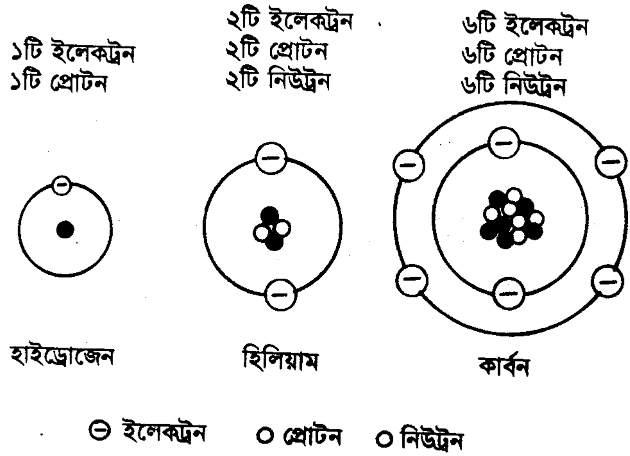

[চিত্র ২১]

আগেই বলা হয়েছে যে, হাইড্রোজেনের পরমাণু সবচেয়ে হালকা ; কারণ এর নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন আর এর চারিদিকে মাত্র একটি ইলেকট্রনই ঘোরে। হাইড্রোজেনের চেয়ে জটিলতর হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে থাকে দু'টি প্রোটন, দুটি নিউট্রন আর নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে দু'টি ইলেকট্রন। অধিক সংখ্যক প্রোটন,

নিউট্রন এবং ইলেকট্রন অপেক্ষাকৃত ভারি পরমাণু গঠন করে। ২.১ চিত্রে কয়েকটি পরমাণুর গঠন দেখানো হলো।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন এক ধরনের নিউক্লিয়ার বলের কারণে একত্রিত থাকে —এই বল আঠার ন্যায় কাজ করে।

ইলেকট্রনের ব্যাস প্রোটনের ব্যাসের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। ইলেকট্রনের ব্যাস (০.০০০০০০০০০০০০২২ ইঞ্চি অর্থাৎ ২২×১০^{-১৪} ইঞ্চি)। কিন্তু প্রোটনের চেয়ে ইলেকট্রনের আয়তন বেশি হলেও ইলেকট্রনের ভর ও প্রোটনের ভরের মধ্যে আকাশ–পাতাল পার্থক্য ; ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন প্রায় ১৮৪০ গুণ ভারি। নিউট্রনের ব্যাস ও ভর প্রোটনের ব্যাস ও ভরের প্রায় সমান।

আগেই বলা হয়েছে ইলেকট্রন ও প্রোটনের চার্জের পরিমাণ সমান কিন্তু চার্জদ্বয় বিপরীতধর্মী। কাজেই কোন পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মোট চার্জ শূন্য অর্থাৎ ঐ পরমাণুটি বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। যদি কোন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন তাড়ানো হয় তবে ইলেকট্রন কমতির ফলে ঐ পরমাণু পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট হবে। তেমনিভাবে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ পরমাণুর কক্ষে একটি ইলেকট্রন ঢুকানো হলে নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ–বৃদ্ধির ফলে তা' নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট হবে। এ ধরনের চার্জযুক্ত পরমাণুকে 'আয়ন' বলে। ইলেকট্রনের পরিমাণ কম হলে তা' 'পজিটিভ আয়ন' আর ইলেকট্রনের পরিমাণ বেশি হলে তা হবে 'নেগেটিভ আয়ন'।

প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ছাড়াও পরমাণুতে আরও বহু কণিকার অস্তিত্ব জানা গেছে। নিউক্লিয়াসকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে এগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

পদার্থের শক্তি কত ?

পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় পরমাণু। এই ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে যে কি পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত করে তাকে ভেঙে ফেলা যায়। এর ফলে যে অকল্পনীয় শক্তি নির্গত হয় তাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। এর নাম পরমাণু শক্তি বা এটমিক এনার্জি। নিউক্লীয় চুল্লীর সাহায্যে বিভিন্ন দেশে আজ অব্যাহতভাবে কম খরচে বিদ্যুৎ

উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমার বিপুল ধ্বংসাত্বক শক্তি সম্পর্কেও নিশ্চয়ই তোমরা অবগত আছো।

আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পদার্থ ও শক্তি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কিন্তু আজ প্রমাণিত হয়েছে যে পদার্থ ও শক্তির মধ্যেকার কোন সীমারেখা নেই। পদার্থ ও শক্তি প্রকৃতির একই ঘটনার দুটি বিভিন্ন সত্তা। বিশেষ অবস্থায় পদার্থ থেকে শক্তি এবং শক্তি থেকে পদার্থ সৃষ্টি বাস্তব সত্য। শক্তি অবলুপ্ত হলে যে পদার্থ সৃষ্টি হয় আর পদার্থকে যে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা বুঝা যায় ঃ

$$E = mc^2$$

এখানে m হচ্ছে পদার্থের ভর যার হ্রাসের কারণে ঐ পরিমাণ শক্তি লাভ করা সম্ভব। c হচ্ছে আলোকের গতি (প্রতি সেকেণ্ডে যার মান ৩০০০০০ কি.মি)। এই সমীকরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে খুবই সামান্য ভরের রূপান্তরের ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তির উৎপাদন সম্ভব।

তিন

কঠিন পদার্থের গঠনভঙ্গি

অবস্থাভেদে একই পদার্থ–কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থাতেই থাকতে পারে। পানির উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাধারণ অবস্থায় আমরা যে পানি ব্যবহার করি তা হচ্ছে তার তরল অবস্থা আর বরফ হচ্ছে এই পানিরই কঠিন অবস্থা। বরফের কারখানা থেকে বড় বড় বরফ খণ্ড পাওয়া যায়। এ বরফই আবার মানুষ ইটের মতো হাতের উপর বা মাথায় করে বহন করে নিয়ে যায়। এগুলিকে কাঠের মতো করে কাটতে বাটালি দরকার পড়ে। আবার এই পানিকে উত্তপ্ত করলে তা জলীয় বাষ্প হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। জলীয় বাষ্প হচ্ছে পানির বায়বীয় অবস্থা। একই পদার্থের এইরূপ রূপান্তরের জন্য তার অণুগুলিই মূলত দায়ি ; অণুর অবস্থার তারতম্যের জন্য পদার্থের অবস্থারও তারতম্য হয়। কঠিন পদার্থের অণুগুলি সবচেয়ে বেশি ঘন–সন্নিবিষ্ট বলে এদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি বেশি। ফলে পদার্থের কাঠামোতে এদের পরমাণুগুলি বেশ মজবুত বল দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু তরল পদার্থের অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব কঠিন অবস্থায় অণুগুলির দূরত্ব অপেক্ষা বেশি ; ফলে তাদের মধ্যে আকর্ষণী শক্তিও অপেক্ষাকৃত কম। আর বায়বীয় অবস্থায় পদার্থের অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব অনেক বেশি ; ফলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তিও খুব কম হওয়ায় পদার্থের অণুগুলি প্রায় স্বাধীনভাবেই ছুটাছুটি করতে পারে।

কঠিন পদার্থ যে কোন নির্দিষ্ট অবয়ব বা আকৃতি বজায় রাখতে পারে তা আমরা সবাই জানি। খুব ঘন সন্নিবিষ্ট অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি খুব বেশি বলে কঠিন পদার্থের অংশগুলি সহজে আলাদা করা যায় না।

শ্রেণী বিভাগ

কঠিন পদার্থকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

১. কেলাসিত (বা স্ফটিকাকার) কঠিন পদার্থ (Crystalline solids)
২ অদানাদার কঠিন পদার্থ (Amorphous solids)।

১. **কেলাসিত কঠিন পদার্থ** ঃ এই সমস্ত দানাদার কঠিন পদার্থের অণু বা পরমাণু গুলি কোন বিশিষ্ট ভঙ্গিতে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। এভাবে সাজানো থাকে বলে এদের সুষম জ্যামিতিক আকার আছে। মিছরি, লবণ, ফিটকিরি, বালু প্রভৃতি পদার্থ নির্দিষ্ট আকারে দানাবিশিষ্ট। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মিছরি বা ফিটকিরির কয়েকটি করে মসৃণ সমতল পিঠ আছে। বিভিন্ন কেলাসের পিঠের সংখ্যা সমান নয়। এই পিঠের সংখ্যার উপর এদের আকারও নির্ভর করে। দানাদার লবণের আছে ছয়টি পিঠ আর ফিটকিরির আছে আটটি। যে কোন নির্দিষ্ট পদার্থের সকল কেলাসের আকার একই হয়। কেলাসিত পদার্থের আকার দেখে এদেরকে চেনা মোটেই কষ্টকর নয়।

সারিবদ্ধভাবে সাজানো অসংখ্য পরমাণু বা অণুর দ্বারা এক একটি কেলাস গঠিত হতে পারে। তামার একক–কেলাসের কথাই ধরা যাক। হিসেব করে দেখা গেছে এক সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট এ রকম একটি কেলাসের, যে কোন দিকে ৩০,০০০,০০০টি পরমাণু রয়েছে। এভাবে সারিবদ্ধ অবস্থাতেও কেলাসের অণু বা পরমাণুর পক্ষে অনবরত দোলা সম্ভব এবং এরা হয়ত দ্রুত কম্পনরত অবস্থায় আছে। কাজেই নড়াচড়ার সময়েও এই অণুগুলি প্রায় সব দিকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা থাকে।

২. **অদানাদার কঠিন পদার্থ** ঃ যে সমস্ত কঠিন পদার্থের কোন নির্দিষ্ট সুষম অভ্যন্তরীণ গঠন বা প্রকৃতিগত কোন জ্যামিতিক আকার নেই তাদেরকে অদানাদার বা অনিয়তকার পদার্থ বলা হয়ে থাকে। কেলাসের অণু বা পরমাণুর মতো এদের অণু বা পরমাণু কোন বিশিষ্ট ভঙ্গিতে সারিবদ্ধভাবে থাকে না।

কাচ, কাঠ–কয়লা, ময়দা প্রভৃতি পদার্থ 'এমোরফাস' বা অদানাদার কঠিন পদার্থের উদাহরণ। 'এমোরফাস' শব্দের মূল হচ্ছে গ্রীক—অর্থ হলো 'অবয়বহীন'। অদানাদার কঠিন পদার্থের অণু–পরমাণু তরল পদার্থের অণু–পরমাণুর মতোই অবিন্যস্ত। এ ধরনের পদার্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ (ক) এদের নির্দিষ্ট

কোন গলনাঙ্ক নেই, (খ) পদার্থের ধর্ম বা গুণাগুণ কোন বিশেষ দিকের উপর নির্ভরশীল নয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠিন পদার্থ কেলাসিত অবস্থায় থাকে। তাই এখানে শুধুমাত্র কেলাসের গঠনভঙ্গিই আলোচিত হবে।

পরমাণুগুলির পারস্পরিক বন্ধনের প্রকারভেদে কেলাসিত কঠিন পদার্থকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ যেমন আয়নিক, সহযোজী ও আণবিক কেলাস এবং ধাতু।

আয়নিক কেলাস

বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূলে রয়েছে পরমাণুর ইলেকট্রন। এরাই হচ্ছে পরমাণুর মধ্যে ঘনিষ্টতা বা মিলনের মাধ্যম। দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু যখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনুকূল পরিবেশে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন এদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ৮–ইলেকট্রন সম্পন্ন অপরিবর্তনশীল অক্ষ সৃষ্টির একটি প্রয়াস হয়। লিথিয়াম ও বেরিলিয়াম মৌলের অবশ্য ২–ইলেকট্রন সম্পন্ন হিলিয়াম পরমাণুর মতো স্থির বা অপরিবর্তনশীল অক্ষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পরমাণুগুলির মধ্যে ইলেকট্রন বিনিময় কিংবা ইলেকট্রন ভাগাভাগি হয় বলা যেতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় ইলেকট্রন যদি একটি পরমাণু হতে সংযোগকারী পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয় তাহলে সহজেই বুঝা যায়, যে পরমাণুটি উক্ত ইলেকট্রন প্রদান করে তা 'পজিটিভ আয়ন' ; আর যে পরমাণুটি উক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে তা 'নেগেটিভ আয়নে' রূপান্তরিত হয়। এভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের দ্বারা যে দু'টি বিপরীতধর্মী কণার সৃষ্টি হয় তারা কুলম্ব–বল দ্বারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। এবং এভাবেই কোন রাসায়নিক যৌগের সৃষ্টি হয়।

টীকা ঃ মৌলিক পদার্থের সবগুলিই রাসায়িনক ভাবে সক্রিয় নয়, কতকগুলি নিস্ক্রিয় পদার্থও রয়েছে। সাধারণতঃ যে সমস্ত পদার্থের পরমাণুর শেষের (সর্ববহিঃস্থ) কক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যা ৮ (একমাত্র একটি কক্ষের অধিকারী ইলেকট্রনের বেলায় এই সংখ্যা ২) সেগুলি এ শ্রেণীর। রসায়নশাস্ত্রে এগুলিকে নিষ্ক্রিয় (inert) পদার্থ বলা হয়।

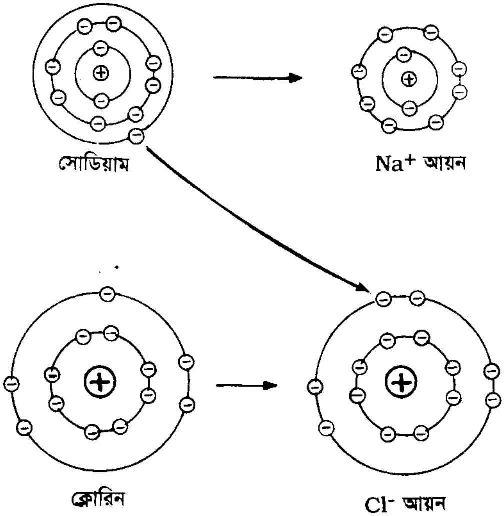

[চিত্র ৩·১]

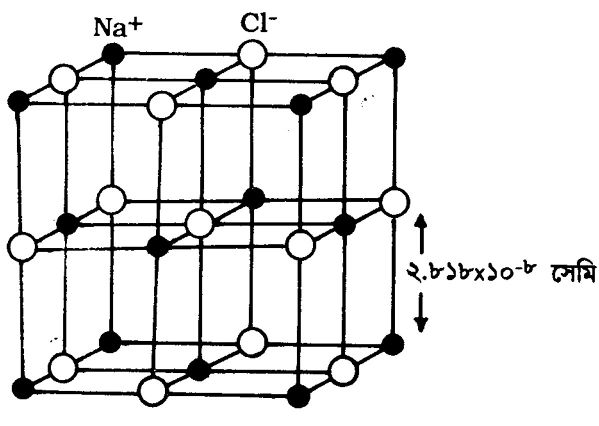

[চিত্র ৩·২ সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসের গঠন]

মৌলের সবচেয়ে বাইরের কক্ষে অবস্থিত ইলেকট্রনই সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এজন্য এদেরকে 'যোজনী ইলেকট্রন' বলা হয়ে থাকে।

সোডিয়ামের একটি মাত্র যোজনী ইলেকট্রন আর ক্লোরিন মৌলের পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষে সাতটি ইলেকট্রন রয়েছে। উত্তপ্ত সোডিয়াম যখন ক্লোরিন গ্যাসের সংস্পর্শে আসে তখন সোডিয়াম পরমাণু তার বহিঃস্থ কক্ষের একমাত্র ইলেকট্রন ক্লোরিন পরমাণুকে দান করে ; ফলে সোডিয়াম ও ক্লোরিন উভয়ই নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের মত ৮–ইলেকট্রন বিশিষ্ট সর্ববহিঃস্থ কক্ষ লাভ করে (চিত্র ৩.১)। এভাবে সৃষ্ট পজিটিভ সোডিয়াম (Na^+) ও নেগেটিভ ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন দুটির মধ্যে কুলম্ব–বলের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যার ফলে সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু ($NaCl$) বা সাধারণ লবণ উৎপন্ন হয়। $NaCl$ আয়নিক কেলাসের একটি উদাহরণ। পূর্ব পৃষ্ঠায় সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসের পরিকল্প চিত্র দেখানো হলো।

এ কেলাসের কণাগুলি প্রত্যেকটি চার্জবিশিষ্ট (পজিটিভ ও নেগেটিভ) হওয়ার ফলে আয়নগুলির আকর্ষণ ক্ষমতা কোন নির্দিষ্ট দিকে সীমাবদ্ধ না হয়ে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, প্রত্যেকটি Cl^- আয়ন চারপাশের ছয়টি Na^+ আয়নের উপর এর আকর্ষণে আবদ্ধ আছে এবং প্রতিটি Na^+ আয়ন এর চারপাশের ছয়টি Cl আয়নের উপর আকর্ষণ বিস্তার করে আছে। এ ধরনের কেলাসের আয়নগুলি কঠিন ল্যাটিস বা মূল কাঠামোর নির্দিষ্ট বিন্দুতে আবদ্ধ থাকে বলে এরা বেশ মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ। আর এজন্য এরা সাধারণত কঠিন ও ভঙ্গুর হয় এবং এদের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বেশ উঁচু। এরা কঠিন অবস্থায় অপরিবাহী ; কেননা বিদ্যুৎ বহনকারী আয়নগুলি কাঠামোর নির্দিষ্ট বিন্দুতে আবদ্ধ থাকে এবং এখানে কোন মুক্ত ইলেকট্রনও থাকে না। কিন্তু গলিত অবস্থায় এরা বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে উঠে। কেলাসের বিশিষ্ট সারিবদ্ধ গঠন সম্পর্কে জানতে হলে এক্স–রশ্মি দিয়ে এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স ফন্‌লাউ এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ডব্লিউ. এল. ব্রাগ কেমব্রিজের ছাত্র থাকাকালীন লাউ এর পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ডব্লিউ . এল. ব্রাগের পুত্র ডব্লিউ. এইচ. ব্রাগ (১৮৬২–১৯৪২ খ্রি:) এ পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন এবং আরো জটিল পদার্থের গঠন নির্ণয় করতে সক্ষম হন। তিনি

হীরকের গঠন নির্ণয় করেন। এজন্যে পিতা ও পুত্র যৌথভাবে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সহযোজী কেলাস

সহযোজী কেলাসে পাশ্ববর্তী পরমাণুগুলি যোজনী ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে নেয়। এখানে সংশ্লিষ্ট পরমাণুগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ইলেকট্রন আদান প্রদান বা বিনিময় হয় না বরং আংশিকভাবে আদান প্রদান হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পরমাণু প্রত্যেকে একটি করে ইলেকট্রন প্রদান করে এক জোড়া ইলেকট্রন সৃষ্টি করে যাতে ইলেকট্রন-যুগল জনক-পরমাণু দু'টির সাথে জড়িত থেকে এদেরকে মজবুত রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। এভাবে পরমাণু দু'টির মধ্যে সৃষ্ট এক প্রকার বিনিময় বল পরমাণু দুটিকে আবদ্ধ করে অণুর স্থায়িত্ব প্রদান করে।

আমরা দেখেছি আয়নিক মৌলের আয়নগুলির প্রভাব বিশেষ একদিকে না হয়ে চারদিকে পরিব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে এখানে অণুর মধ্যে একটি পরমাণুর আকর্ষণ শুধুমাত্র অণুস্থিত অন্য পরমাণুর দিকে নিবদ্ধ। এ অণুর বাইরে অন্য কোন অণু বা পরমাণুর প্রতি এর আকর্ষণ নেই বললেই চলে। কাজেই এক বিশেষ দিকে নিবদ্ধ আকর্ষণ এ ধরনের সহযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য।

ডায়মণ্ড বা হীরক, গ্রাফাইট, সিলিকন, জার্মেনিয়াম প্রভৃতি সহযোগী কেলাসের আদর্শ উদাহরণ।

হীরক ও গ্রাফাইট আসলে একই কার্বনের দুটি কেলাস রূপ মাত্র। অথচ এদের গুণাবলীর মধ্যে এতবেশি তারতম্য যে তা আমাদের কাছে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

হীরক মহামূল্যবান রত্ন। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে হীরক পাওয়া যায়। কোহিনুর হীরক পৃথিবীবিখ্যাত। মোঘল বাদশাহদের ব্যবহৃত হীরক কোহিনুর এখন ইংল্যাণ্ডের রানীর মুকুটে শোভা পায়।

পৃথিবীখ্যাত হীরকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো :

নাম	ওজন (ক্যারেট) [১ভরি ~ ৬০ ক্যারেট]	প্রাপ্তিস্থান	তারিখ	বর্তমান মালিক
কুলিনান	৩১০৬	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯০৫	নয়টি বড় ও ৯৬টি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। সবচেয়ে বড় খণ্ড (৫৩০.২ ক্যারেট) 'দি স্টার অব আফ্রিকা' নামে পরিচিত। বৃটিশ রাজমুকুট।
ইক্সেলসিয়র	৯৯৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৮৯৫	একশ' খণ্ডে বিভক্ত
কোহিনুর	৮০০	ভারত	(১৩০৪)	বৃটিশ রাজমুকুট
জোনকার	৭২৬	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৩৪	বারো খণ্ডে বিভক্ত
জুবিলী	৬৫০	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৮৯৫	আমেরিকা
ইম্পেরিয়াল (বা ভিক্টোরিয়া)	৪৬৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৮৮৪	—
নিয়ারকস্	৪২৬	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৫৪	এস. এস. নিয়ারকস
রিজেন্ট (বা পিট)	৪১০	ভারত	১৭০১	লুভর
নিজাম	৩৪০	ভারত	১৮১৮	ভারত (?)
ওর্লফ (দরিয়া-ই-নূর)	৩০০	ভারত	১৭শ শতক	মস্কো
স্টার অবদি সাউথ	২৬২	ব্রাজিল	১৮৫৩	ভারত
ইংলিশ ড্রেসডেন	১২০	ব্রাজিল	১৮৫৭	ভারত
হোপ	১১২	ভারত	১৬৪২	স্মিথসোনিয়ান (আমেরিকা)
ডাড্লি	৮৩	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৮৬৯	ডাড্লির কাউন্ট-পত্নী
ইউরেকা	২১	দক্ষিণ আফ্রিকা		—

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী ময়সাঁ দাবি করেন যে তিনি কৃত্রিম হীরক তৈরি করতে সফল হয়েছেন। কিন্তু অনেকেই এতে সন্দেহ পোষণ করেন—তাঁদের মতে

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের আগে কেউই কৃত্রিম হীরক তৈরিতে সফলতা লাভ করতে পারেননি। সেই যাই হোক ; হীরক অষ্টতল বা ঘনাকার কেলাস। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এটি সবচেয়ে কঠিন ; ঘনত্ব ৩·৫১ গ্রাম/মিলিলিটার। এটি তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। বিশুদ্ধ হীরক বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। সাধরাণতঃ এর সাথে অল্প পরিমাণ পদার্থ মেশানো হয় বলে তা নানা বর্ণের হয়ে থাকে। হীরক কেটে এর তল ও কোণের সংখ্যা বাড়ালে এর উজ্জ্বলতাও বেড়ে যায়। এক্স–রশ্মির সাহায্যে আসল ও কাচের তৈরি নকল হীরকের পার্থক্য ধরা যায়। এক্স–রশ্মি কাচের ভিতর দিয়ে যেতে পারে না কিন্তু আসল হীরকের ভিতর দিয়ে যেতে পারে।

অপরপক্ষে গ্রাফাইট বেশ নরম ; রং ধূসরবর্ণ, ঘনত্ব ২·২৫ গ্রাম/মিলিলিটার। এটি তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। গ্রাফাইট গ্রীক 'গ্রাফু' থেকে এসেছে; এর অর্থ 'আমি লিখি' — গ্রাফাইট দিয়ে লেখা যায় বলে এর এ নামকরণ। সামান্য ঘর্ষণেই কাগজের উপর দাগ পড়ে বলে গ্রাফাইট লেড পেন্সিলের সীসা রূপে ব্যবহৃত হয়। গ্রাফাইটের আধুনিক ব্যবহার নিউক্লিয়ার চুল্লীতে — ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণকারী নিউট্রনের গতি শ্লথ করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। গ্রাফাইট–চূর্ণ পিচ্ছিল–কারক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ শলাকা, বৈদ্যুতিক চুল্লী দণ্ড, উচ্চ তাপের 'ক্রুসিবল' তৈরি করতে এবং ইলেকট্রো–টাইপের কাজে গ্রাফাইট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

হীরক ও গ্রাফাইট একই কার্বনের দুই রকম কেলাস হওয়া সত্ত্বেও তাদের গুণাবলীর আকাশ–পাতাল পার্থক্য নিচের আলোচনা থেকে বুঝা যাবে।

প্রথমেই গ্রাফাইটের কথা ধরা যাক। ৩·৩ নং চিত্রে গ্রাফাইটের একটি পরিকল্প চিত্র দেওয়া হয়েছে।

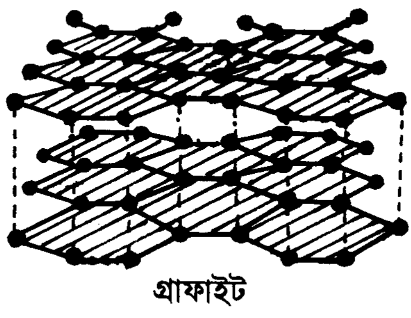

গ্রাফাইট

[চিত্র ৩.৩]

আমরা জানি কার্বনের চারটি যোজনী ইলেকট্রন আছে। উপরের চিত্র হতে একথা পরিষ্কার যে এখানে প্রত্যেকটি কার্বন পরমানুর চারটি যোজনী ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটি

একই সমতলে অবস্থিত পাশ্ববর্তী অন্যান্য কার্বন পরমাণুর সাথে তিনটি ইলেকট্রন-যুগল গঠন করে এবং ফলে সমশক্তির তিনটি সহযোজী বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এভাবে ষড়ভূজ আকৃতির কার্বনবৃত্তের সৃষ্টি হয়। এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বিশাল গ্রাফাইট অণুর চাদর (sheet) তৈরি করে। কার্বন পরমাণুর চতুর্থ ইলেকট্রনটি এ চাদর সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে না বরং পাশ্ববর্তী চাদরের কার্বন পরমাণুর সাথে দুর্বল বন্ধনের সৃষ্টি করে। এভাবেই স্তূপাকৃতি কেলাসের সৃষ্টি হয়। একই সমতলে অবস্থিত কার্বন পরমাণুগুলির পরস্পরের দূরত্ব মাত্র ১.৪২×১০^{-৮} সে.মি. আর পার্শ্ববর্তী দুটি চাদরের দূরত্ব এর প্রায় আড়াই গুণ অর্থাৎ ৩.৪×১০^{-৮} সে. মি.।

একই সমতলের কার্বন পরমাণুগুলির মধ্যে সহযোজী বন্ধন বেশ মজবুত ; ফলে গ্রাফাইটকে সহজে গলানো যায় না (গলনাঙ্ক ৩৫০০° সেন্টিগ্রেড)। গ্রাফাইটের চাদরগুলির দূরত্ব বেশি হওয়ায় এদের মধ্যে কোনরূপ সহযোজী বন্ধনের আশা করা যায় না—বরং পাশ্ববর্তী চাদরগুলি মধ্যে এক ধরনের দুর্বল ভ্যান-ডার-ওয়ালস বল বিদ্যমান। এবং এটিই গ্রাফাইটের পিচ্ছিল ধর্মের জন্য দায়ি। কার্বনের চতুর্থ যোজনী ইলেকট্রনের দুর্বল বন্ধনের দরুন গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহীও বটে।

অপরপক্ষে কার্বনের অন্যরূপ হীরকের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক খুব উঁচু। ৩·৪ নং চিত্রে প্রদত্ত হীরকের পরিকল্প নক্সা খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করলে এটি সহজেই বুঝা যাবে। এক্ষেত্রে সহযোজী-বন্ধন প্রভাব একই সমতলে ও সাথে সাথে উপরে ও নিচের দিকে—এই তিন দিকে সমভাবে কার্যকরী হয়। অর্থাৎ প্রতিটি কার্বন পরমাণুর চারটি যোজনী ইলেকট্রন পাশ্ববর্তী অন্যান্য কার্বন পরমাণুর সাথে চারটি ইলেকট্রন যুগল গঠন করে। ফলে সমশক্তির চারটি সহযোগী বন্ধন ঊর্ধ্ব, অধঃ ও সমান্তরাল —এই তিনদিকে সংগ্রথিত অবস্থায় বিস্তৃত হয়ে বিশাল আকারের অণুর সৃষ্টি করে। এভাবে অণুর সৃষ্টিতে

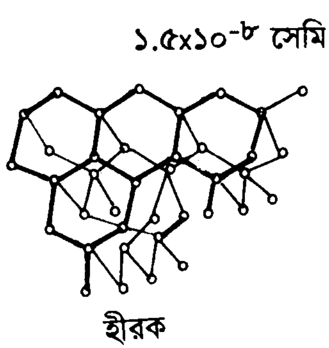

[চিত্র ৩·৪]

হীরক গঠিত হয় বলে তা' অত্যন্ত কঠিন ও মজবুত হয়। সমশক্তির প্রতিটি মজবুত বন্ধনকে শিথিল করতে প্রচুর শক্তির দরকার। তাই হীরককে গলাতে ৩৫০৭° সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রার প্রয়োজন হয়। আর হীরকের পরমাণুতে মুক্ত ইলেকট্রন না থাকার দরুন এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়।

আণবিক কেলাস

হাইড্রোজেন, আর্গন, ক্লোরিন প্রভৃতি গ্যাসের কঠিন অবস্থা (solidified gas) আণবিক কেলাসের উদাহরণ। সব ধরনের কেলাসের মধ্যে এদের গলনাঙ্ক সবচেয়ে কম। কেননা এধনের কেলাসের অণু এক ধরনের দুর্বল ভ্যান-ডার-ওয়ালস বল দ্বারা সৃষ্ট।

ধাতু

ধাতুর কেলাস ল্যাটিস বা মূল-কাঠামোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে এদের ল্যাটিস গঠন বেশির ভাগই ফাঁকা এবং যোজনী ইলেকট্রন-সংখ্যার চেয়ে এদের চারপাশের (একই রকমের) পরমাণু সংখ্যা বেশি।

সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি ধাতুর যোজনী ইলেকট্রন সংখ্যা দেখা যাবে যে এদের ল্যাটিস গঠন বেশির ভাগই ফাঁকা এবং যোজনী ইলেকট্রন সংখ্যার চেয়ে এদের চারপাশের একই রকমের পরমানু সংখ্যা বেশি।

সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি ধাতুর যোজনী ইলেকট্রন-সংখ্যা মাত্র একটি। অথচ এদের ল্যাটিসে প্রতিটি পরমাণু অন্তত আটটি একই পরমাণুর সাথে যুক্ত। সুতরাং ধাতু পরমাণুর পক্ষে এদের কেলাসে বিশুদ্ধ সহযোজী বন্ধন কল্পনা করা অবাস্তব। কেননা এক যোজনী ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণু শুধুমাত্র অনুরূপ আর একটি পরমাণুকে সহযোজী বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

সোডিয়াম ধাতুর কেলাস-ল্যাটিস ঘনক-আকৃতির (চিত্র ৩.৫)। ঘনকটির কেন্দ্রে একটি পরমাণু ও এর ল্যাটিস বিন্দুগুলিতে আরো আটটি পরমাণু আছে। এরূপ ল্যাটিসকে তনুকেন্দ্রিক ঘনক ল্যাটিস বলা হয়।

ধাতু পরমাণুর আয়নায়ন বিভবের মান খুবই কম। এথেকে বুঝা যায় যে ধাতুর যোজনী ইলেকট্রন পরমাণু কাঠামোর সাথে খুবই দুর্বল প্রকৃতির বল দ্বারা আবদ্ধ।

ধাতুর যোজনী ইলেকট্রন চলনশীল বলা যেতে পারে। এরা এক পরমাণু থেকে আরেক পরমাণুতে যাতায়াত করতে পারে। ফলে ধাতুর কেলাস ল্যাটিসে আয়নিক ধর্মের উৎপত্তি হয়।

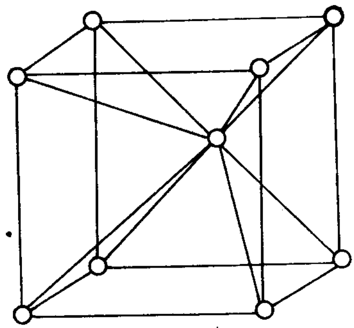

সোডিয়াম ধাতুর মূলকাঠামো

[চিত্র ৩·৫]

ল্যাটিসের কেন্দ্রস্থিত ধাতুর যোজনী ইলেকট্রন অনুরূপ পরমাণুর সাথে সহযোজী বন্ধন সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ইলেকট্রন চলনশীল হওয়ায় এটি সাতটি নিকটতম পরমাণুর সাথে এক ধরনের 'রিজোন্যান্স' পদ্ধতি দ্বারা এরূপ সহযোজী বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে।

ধাতুর কেলাস–ল্যাটিসে আয়নিক ধর্মের উৎপত্তি হয় বলে আমরা ধাতুকে পজিটিভ আয়নের শাঁস এক ইলেকট্রন সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত মনে করতে পারি। ধাতুর ল্যাটিস বিন্দুগুলি একইরূপ পরমাণু কণা দ্বারা অধিকৃত। এই ল্যাটিসের ফাঁকা অংশের মধ্যে দিয়ে ধাতুর যোজনী ইলেকট্রনগুলি সহজেই যাতায়াত করতে পারে। যোজনী ইলেকট্রনগুলি ইলেকট্রন–সাগরের উৎস এবং ধাতুর ল্যাটিসস্থিত আয়নের সাথে এক দুর্বল বল দ্বারা আবদ্ধ।

চার

কঠিন পদার্থের গুণাবলী

প্রকৃতিতে যে সমস্ত কঠিন পদার্থ (বিশেষ করে কেলাস) পাওয়া যায় তাদের স্বচ্ছতা এবং উজ্জ্বল ও চকচকে সুন্দর রং যুগে যুগে মানুষকে আকর্ষণ করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই ভাল ভাল কেলাস মূল্যবান রত্ন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রথমে কেলাসের বাইরের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়েই পরীক্ষা করা হতো, কিন্তু ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা এদের ভিতরের আকৃতি, প্রকৃতি ও বিভিন্ন গুণাগুণ পরীক্ষণের কাজে ঝুঁকে পড়েন।

কঠিন পদার্থ ও কেলাসের বিভিন্ন গুণাগুণ বিশেষ করে যান্ত্রিক, তাপীয়, বৈদ্যুতিক, চৌম্বক ও আলোক সম্বন্ধীয় গুণ এবং অতিবাহিতার ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। পদার্থের এ সমস্ত গুণাগুণ আলোচনা করলে এদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মাবে।

যান্ত্রিক গুণাবলী

কঠিন পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলীর মধ্যে বিদারণ (cleavage), কাঠিন্য ও স্থিতিস্থাপকতা উল্লেখযোগ্য।

আমরা যদি মাইকা কেলাসকে ভাঙ্গার চেষ্টা করি তবে তা' আয়নার মতো সুন্দর মসৃণ পৃষ্ঠসহ পাতলা পাতে বিভক্ত হয়। ক্যালসাইট কেলাসকেও ফাড়ার চেষ্টা করলে অনুরূপ মসৃণ উজ্জ্বল পাত পাওয়া যায়। কিন্তু কোয়ার্জ কেলাসকে ফাড়লে যে টুকরা পাওয়া যায় তার পৃষ্ঠ বড় অমসৃণ। নির্দিষ্ট তল অভিমুখে এর বিদারণ খুবই সহজ। প্রথমে সঠিক জায়গায় দাগ কাটতে হয়, তারপর দাগে ধারালো ইস্পাতের ব্লেড রেখে ব্লেডের পিছনে সঠিকভাবে আঘাত করতে হয়।

সবকিছু সঠিক হলে হীরক অতি সুন্দর ভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়। আর সামান্য ভুলের জন্য অর্থাৎ বিদারণ তল অভিমুখে এ কাজ না করলে হীরক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে। কাজেই কাজটিতে যে সাহস, দৃঢ়তা ও সর্বোপরি দক্ষতার প্রয়োজন তা' সহজেই অনুমেয়। এ ব্যাপারে এক মজার গল্প বলছি। ৩১০৬ ক্যারেট ওজনের প্রসিদ্ধ কুলিনান হীরক খণ্ড যখন পাওয়া যায় তখন নিউ প্রিমিয়ার খনি কোম্পানি বিপদে পড়েন। কারণ এত বড় হীরক রত্ন হিসেবে ব্যবহার করার কথা চিন্তাই করা যায় না —আর তা' ছাড়া কয়জনই বা এই হীরক কিনবে? যা' হোক শেষ পর্যন্ত কোম্পানি এটিকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে ট্রান্সভাল গভর্ণমেন্টের কাছে বিক্রি করে দেন। তারা অবশ্য ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্ম বার্ষিকীতে এটি উপহার হিসেবে দেন।

এখন সমস্যা দেখা দিল কিভাবে কাকে দিয়ে এটি কাটা যায়। অবশেষে আমস্টারডামের মিঃ জে. আচেরকে (J. Asscher) এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হলো। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ২–৪৫ মিনিটে তিনি এ কাজে হাত দেন। আগেই হীরকে একটি সরু লম্বা খাত (groove) কাটা হয়েছিল। মিঃ আচের হীরক কাটানোর কাজে ব্যবহৃত ইস্পাত ব্লেড এই লম্বা খাতে রেখে একটি ভারি ইস্পাত–দণ্ড দিয়ে সতর্কতার সাথে হঠাৎ করে আঘাত করেন। এতে হীরকের তো কিছুই হলো না বরং ব্লেডটিই ভেঙ্গে গেল। এতে মিঃ আচের ঘেমে যান— কপালের ঘাম মুছে নিয়ে তিনি পুনরায় চেষ্টা করেন। এবার সত্যি সত্যিই তিনি সফল হলেন—বিরাট হীরক পূর্ব পরিকল্পনা মতো দুইখণ্ডে (যথাক্রমে ২০৩০ও ১০৬৮ ক্যারেটের) ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু মিঃ আচেরও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে মিঃ আচের যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন তিনি আবার কাজে লাগলেন এবং চূড়ান্তভাবে ১০৫ খণ্ডে কুলিনানকে ভাগ করা হলো। এদের মধ্যে ৫৩০.২ ক্যারেটের সবচেয়ে বড় খণ্ডটি 'দি স্টার অব আফ্রিকা' নামে প্রসিদ্ধ।

কাঠিন্য খনিজ পদার্থ চেনার কাজে উল্লেখযোগ্য ভাবে সহায়ক হয়। তা ছাড়া যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঘষার কাজ করা হয় সেখানে কেলাসিত পদার্থের এই গুণের ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। জার্মান খনিজ তত্ত্ববিদ মোজ (Mohs) ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে আদর্শ খনিজ নিয়ে কাঠিন্যের তারতম্য অনুসারে একটি বিশেষ স্কেল উদ্ভাবন করেন। এটি মোজ স্কেল নামে পরিচিত :

১। টাল্‌ক	৫। অ্যাপাটাইট	৯। কোরাণ্ডাম (রুবি ইত্যাদি)
২। জিপসাম	৬। অর্থোক্লেজ	১০। হীরক।
৩। ক্যালসাইট	৭। কোয়ার্জ	
৪। ফ্লোরাইট	৮। টোপাজ	

মোজ স্কেলের নম্বর ১,২ ইত্যাদি দ্বারা কাঠিন্য বুঝা যায়—এই সংখ্যা যত বড় কাঠিন্যও তত বেশি হবে। পদার্থের কাঠিন্য যদি কোয়ার্জের কাঠিন্যের বেশি অথচ টোপাজের কাঠিন্যের চেয়ে কম হয় তবে মোজ স্কেলে তার নম্বর দাঁড়াবে ৭·৫। টালক সবচেয়ে নরম এবং হীরক সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। আরো সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য উপরোক্ত পদার্থগুলোর আপেক্ষিক কাঠিন্য (গ্রাইণ্ডিং পদ্ধতিতে নির্ণীত) নিচে দেওয়া হলো ঃ

টাল্‌ক	০·০৩	অর্থোক্লেজ	৩৭
জিপসাম	১·২৫	কোয়ার্জ	১২০
ক্যালসাইট	৪·৫	টোপাজ	১৭৫
ফ্লোরাইট	৫	কোরাণ্ডাম	১,০০০
অ্যাপাটাইট	৬·৫	হীরক	১৪০,০০০

হীরকের কাঠিন্যই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এটি কোরাণ্ডামের চেয়ে ১৪০ গুণ এবং জিপসামের চেয়ে এক লক্ষ বারো হাজার গুণ বেশি কঠিন।

কেলাসিত পদার্থের কাঠিন্য সম্পর্কে আরো কিছু বলা যেতে পারে ঃ

(ক) অন্য সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে পদার্থের কাঠিন্য পরমাণু তলগুলির ফাঁকের উপর নির্ভরশীল।

(খ) যোজনী ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে সাথে কাঠিন্যও বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সোডিয়াম ফ্লোরাইড (NaF), ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (MgO), স্ক্যানডিয়াম-নাইট্রাইড (ScN), টাইটানিয়াম কার্বাইড (TiC) প্রভৃতির গঠন সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো। তাদের প্রত্যেকেরই পরমাণু তলের ফাঁক প্রায়

একই, কিন্তু আয়নের যোজনী-ইলেকট্রন সংখ্যা ভিন্ন। নিচের তালিকা দেখলেই বুঝা যাবে যে এদের কাঠিন্যও এই সংখ্যার সাথে সাথে বাড়ছে।

তালিকা - ১

রাসায়নিক গঠন	NaF	MgO	ScN	TiC
আয়নের যোজনী-ইলেকট্রন সংখ্যা	১	২	৩	৪
পরমাণু-তল দূরত্ব ($১০^{-৮}$ সে.মি.)	২·৩১	২·১০	২·২৩	২·২৩
কাঠিন্য (মোজ স্কেল)	৩·২	৬·৫	৭·৮	৮·৯

ইস্পাতের কোন সরু পাতকে মোচড় দিলে তা'র আকারের বিকৃতি ঘটতে পারে। কিন্তু মোচড়ানোর দরুন পাত এর আকৃতি পরিবর্তনে বাধা দেয়, ফলে একে মোচড় দিয়ে ধরতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। মোচড়ানো ছেড়ে দিলে ইস্পাতের পাত আদি আকৃতি ফিরে পায়। অনুরূপভাবে কোন কেলাসের উপর যান্ত্রিক বল প্রয়োগ করলে এর আকৃতির পরিবর্তন ঘটে ; এই পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের উপর নির্ভরশীল। বল খুব বেশি হলে কেলাস বা অন্য কোন কঠিন পদার্থের স্থায়ী বিকৃতি ঘটতে পারে। কিন্তু বল নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলে বিকৃত হয় অস্থায়ী ; এ ক্ষেত্রে বল ছেড়ে দিলে পদার্থ তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। কঠিন পদার্থের এই গুণকে 'স্থিতিস্থাপকতা' (elasticity) বলে।

তাপীয় গুণাবলী

ধাতু নির্মিত চামচ গরম ডাল বা তরকারির মধ্যে রাখলে তার হাতল গরম হ'য়ে উঠে—এটা তোমরা সবাই লক্ষ্য করেছ। আবার ধাতব দণ্ডের একপ্রান্ত আগুনের মধ্যে রেখে অপর প্রান্ত হাতে ধরে রাখলে কিছুক্ষণ পর হাতে বেশ তাপ বোধ হবে। কঠিন পদার্থের এক অংশ হতে অন্য অংশে এভাবে তাপ সঞ্চালনকে তাপ পরিবহন বলে। সমস্ত পদার্থের এই পরিবহন ক্ষমতা আবার সমান নয়। তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থের ধর্মের যে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে অবস্থার আয়তন, ভৌত, বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তাপে কঠিন পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ; ফলে আকার ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। অত্যাধিক উত্তাপে কঠিন পদার্থ গলেও যায়। তামা সাধারণ তাপ মাত্রায় কঠিন আকৃতিতে থাকে, এবং এই অবস্থা ১০৮০ °C তাপমাত্রা পর্যন্ত বজায় থাকে। কিন্তু আরো বেশি গরম করলে এটি তরল আকার ধারণ করে। অবশ্য ২৫৮০ °C এর বেশি তাপমাত্রায় এটি আর তরল থাকে না—তখন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

তাপে প্রায় সব ধরনের কঠিন পদার্থের আয়তন বেড়ে যায় এবং ঠাণ্ডায় আয়তন কমে যায়। সাধারণত খালি চোখে আয়তনের এই হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। তথাপিও তাপে আয়তনের যে বৃদ্ধি ঘটে তা নেহাত কম নয়। ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটি ব্রিজের কথাই ধরা যাক। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকাল অধিক গরম হওয়ায় ব্রিজের দৈর্ঘ্যের প্রসার ঘটে। কোন ব্রিজের দৈর্ঘ্য যদি 0°C তাপমাত্রায় এক হাজার ফুট হয় তবে মাত্র ২০ °C এ এর দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চির বেশি বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। এজন্য ইঞ্জিনিয়ারকে সতর্কতার সাথে বিশেষ ডিজাইনের মাধ্যমে এর সমাধান করতে হয়। স্কটল্যাণ্ডে অবস্থিত দেড় মাইল লম্বা ফোর্থ নামক ব্রিজে সর্বমোট ছয়ফুট পরিমাণ ফাঁক রাখতে হয়েছে। রেললাইনের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে, রেলপথের যে যে স্থানে জোড়া রয়েছে সে স্থানে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা। এটি কোন ত্রুটির জন্য বা লোহা বাঁচানোর জন্য নয় বরং ইচ্ছা করেই এরূপ রাখা হয়েছে। প্রখর সূর্যতাপ বা ট্রেনের চাকার ঘর্ষণে উদ্ভূত তাপে দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে। কাজেই ফাঁক না থাকলে রেলপথ প্রসারিত হওয়ার সময় বেঁকে যেত।

ক্রনোমিটার ও ছোট ছোট ঘড়িতে ব্যালান্স-চক্র ব্যবহৃত হয়। ব্যালান্সচক্রের দোলনকাল চক্রের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। ব্যাসার্ধ বেশি হলে দোলনকালও বেশি হবে। আর কম হলে দোলনকাল কমে যাবে। এই চক্র যদি একই ধাতু দিয়ে তৈরি হয় তবে, গ্রীষ্মকালে অধিক তাপমাত্রায় ধাতুর প্রসারণ ঘটে ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পাবে। ফলে দোলনকাল বৃদ্ধি পেয়ে ঘড়ি 'স্লো' যাবে। আবার শীতকালে ঠাণ্ডায় ব্যাসার্ধ কমে গিয়ে ঘড়ি 'ফাস্ট' যাবে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যালান্স-চক্র দু'ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি হয়। বাইরের অংশ এমন ধাতুর রাখা হয় যার প্রসারণাঙ্ক ভিতরের অংশের তুলনায় বেশি। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি সত্ত্বেও এ ব্যবস্থায় চক্রের

ব্যাসার্ধ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে (চিত্র ৪.১ দেখ) ; ফলে ঘড়ি সঠিক সময় দিয়ে থাকে।

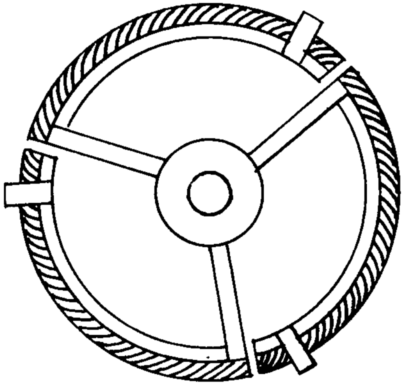

[চিত্র ৪.১]

টমটম বা গরুর গাড়ির কাঠের চাকার বাইরের দিকে একটি লোহার বেড়ি বেশ আঁটসাঁট করে লাগানো থাকে। একজন কামার কাঠের চাকায় কিভাবে এটি লাগিয়ে দেয় তা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে, প্রথমে লৌহ বলয় আগুনে বেশ গরম করা হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় এর ব্যাস বেড়ে যায়, ফলে অতি সহজে এটিকে কাঠের চাকায় পরানো হয়। এর পরে লৌহ চাকাটি ঠাণ্ডা হলে সংকুচিত হয় এবং তখন এটি কাঠের চাকার সাথে বেশ দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

গরমে কঠিন পদার্থের আয়তন বৃদ্ধিকে বহুবিধ ভাবে শিল্পে ব্যবহার করা হয়। মটর ইঞ্জিন–সিলিণ্ডারে লাইনার সংযোজনের সময় এই নীতির ব্যবহার হয়। প্রথমে লাইনারকে তরল অক্সিজেন তাপমাত্রায় রেখে খুব ঠাণ্ডা করা হয়। ঠাণ্ডায় লাইনার সঙ্কুচিত হলে এটিকে অতি সহজে ছিদ্রপথে ঢুকানো হয়। পরে সাধারণ তাপমাত্রায় (অর্থাৎ যখন ঠাণ্ডা থেকে উত্তপ্ত হয়) এটি আকারে বড় হয়ে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

তাপ বৃদ্ধির সাথে পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। উত্তপ্ত হলে বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতুর রোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সিনারমন্ত (Senarmont) সর্বপ্রথম কেলাসের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বা তাপীয় পরিবাহিতা সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। কেলাসে তাপ পরিবাহিতা সব দিকে এক নয়। দেখা গেছে, কতিপয় কেলাসের কোন বিশেষ দিকে তাপ পরিবাহিতা অন্যান্য দিকের পরিবাহিতা অপেক্ষা দুই থেকে চারগুণ বেশি। একই রাসায়নিক গঠনের অদানাদার পদার্থ হতে কেলাসিত পদার্থের তাপ পরিবাহিতা সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। এই পার্থক্য আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে আসে।

তাপ–পরিবাহিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানী ইউকেনের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলি হলো ঃ

(ক) অভিন্ন গঠনের অদানাদার পদার্থ হতে কেলাসিত পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা সাধারণত বেশি।

(খ) কেলাসের তাপ–পরিবাহিতা তাপমাত্রার (কেলভিন স্কেলে) সাথে বিপরীতভাবে সমানুপাতিক। অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহিতা কমে আর তাপমাত্রা কমলে পরিবাহিতা বেড়ে যায়। কিন্তু অদানাদার কঠিন পদার্থের বেলায় এই তাপমাত্রা কমে গেলে সাথে সাথে পরিবাহিতাও কমে যায়।

(গ) কেলাসের রাসায়নিক গঠন যত জটিল হবে তার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা তত কম হবে।

বিজ্ঞানী জিনেটাও তাপ–পরিবাহিতা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো ঃ 'বিদারণের সমান্তরাল দিক হতে তার লম্ব–অভিমুখে কেলাসের তাপ–পরিবাহিতা অনেক কম'।

কোয়ার্জ কেলাস ও কোয়ার্জ–গ্লাসের (অদানাদার) তাপ পরিবহণ ক্ষমতার তুলনামূলক বিচার (তালিকা দ্রষ্টব্য) করলেই উপরের আলোচনা আরো স্পষ্ট হবে।

এখানে তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বিশেষ এক এককে প্রকাশ করা হয়েছে। ১০০°C তাপমাত্রার কোয়ার্জ গ্লাসের জন্য এটি .০০৪৬ একক। এর অর্থ এই যে এক সে. মি. পুরু একটি (সমান্তরাল তলবিশিষ্ট) কোয়ার্জ–গ্লাস–পাতের তলদ্বয়ের তাপমাত্রার পার্থক্য ১°C হলে এবং তাপ–প্রবাহ তলের লম্বাভাবে হলে পাতটির এক বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ·০০৪৬ ক্যালোরি পরিমাণ তাপ সঞ্চালিত

তাপ পরিবহণ ক্ষমতা

তাপমাত্রা °C	কোয়ার্জ কেলাস		কোয়ার্জ গ্লাস
	সমান্তরাল	লম্ব	
১০০	০·০২১	০·০১৩	·০০৪৬
০	০·০৩২	০·০১৭	·০০৩৩
–৭৮	০·০৪৭	০·০২৪	·০০২৮
–১৯০	০·১১৭	০·০৫৯	·০০১৬

হবে। এখানে মনে রাখা উচিত যে এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১°C বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ক্যালোরি বলে।

বৈদ্যুতিক গুণাবলী

মটর গাড়ীতে ব্যাটারি ব্যবহার করতে হয়—তা আমরা সবাই জানি। ব্যাটারী–বিহীন অবস্থায় কেবল একটি সুইচ অন করে এতবড় একটি গাড়ীর ইঞ্জিন চালু করা সম্ভব হতো না। এ রকম একটি ব্যাটারির দু'প্রান্ত যদি মোটা তামার তার দিয়ে যোগ করা হয় তবে সাথে সাথে ব্যাটারি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে। তামার তারের বৈদ্যুতিক রোধ ক্ষমতা (বা রোধতা) খুবই কম এজন্য এটি একটি অতি উত্তম বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতু। ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধতা নেই বললেই চলে। কাজেই এক্ষেত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ কোন রোধ এর সম্মুখীন হয় না বলেই তারের মধ্যে দিয়ে এত অধিক পরিমাণে প্রবাহ চলে যে তাতে ব্যাটারি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অথচ তামার তারের বদলে যদি পলিথিন পাত অনুরূপভাবে ব্যবহার করা হয় তবে এর ভিতর দিয়ে কোন প্রবাহই চলবে না এবং ফলে ব্যাটারির কোন ক্ষতিই হবে না। পলিথিন বিদ্যুৎ অপরিবাহী এবং এর ভিতর দিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ–প্রবাহ চলতে পারে না। তবে পলিথিনেও কিছু না কিছু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এর পরিমাণ এতই কম যে, তাকে প্রবাহ বলে গণ্যই

BANSDOC Dhaka

করা যায় না। এটি বুঝানোর জন্য 'বিদ্যুৎ পরিবাহিতা' কথাটি ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ কত সহজে চলতে পারে তার পরিমাণকে 'পরিবাহিতা' দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে। তামার বিদ্যুৎ প্রবাহ-ক্ষমতা বা 'পরিবাহিতা' পলিথিনের পরিবাহিতার চেয়ে ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (বা ১০^{২৩}) গুণ বেশি। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে তামার তারের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে একই আকার আয়তনের পলিথিনের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে ১০^{২৩} গুণ কম বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে। কাজেই পলিথিনের মধ্য দিয়ে কোন প্রবাহ চলেনি বা পরিলক্ষিত হয়নি তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক তারকে এ ধরনের অপরিবাহী পদার্থে আবৃত করা হয়। আর এজন্যই অপরিবাহী পদার্থে আবৃত বৈদ্যুতিক বালব বা তার স্পর্শ করলেও কোন বৈদ্যুতিক 'শক' লাগে না।

সব ধরনের বস্তুই কমবেশি বিদ্যুৎ পরিবাহী ; কিন্তু রূপা সবচেয়ে বেশি আর পলিথিন সবচেয়ে কম পরিবাহী। বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসাবে রূপা তামার চেয়েও ভাল ; কিন্তু তামা ব্যবহারে খরচ কম বলে তামাই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যুতিক কাজে সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে কম পরিবাহী পদার্থ উভয়েরই ব্যবহার প্রচলিত আছে—তামার মত সুপরিবাহী ধাতু বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনার জন্য আর পলিথিনের মতো অপরিবাহী পদার্থ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অঞ্চলের পদার্থগুলির পরিবাহিতা সুপরিবাহী ও কুপরিবাহীর মধ্যবর্তী মানের অধিকারী। এগুলির মধ্যে গুরত্বপূর্ণ অংশের পদার্থ গুলিকে 'অর্ধপরিবাহী' (semiconductor) বলা হয়ে থাকে। এদের পরিবাহিতা তামার পরিবাহিতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুণ কম। সিলিকন, জার্মেনিয়াম প্রভৃতি অর্ধপরিবাহীর অন্তর্ভূক্ত। এদের সম্পর্কে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হবে।

তামা ও পলিথিন উভয়েরই কঠিন পদার্থ। তবুও তাদের মধ্যে এ পার্থক্য কেন? এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। তামা ও পলিথিনের মতো কঠিন পদার্থের অণু বা পরমাণু আলাদা আলাদা ভঙ্গিতে সজ্জিত বলেই এ পার্থক্য।

বিদ্যুৎ প্রবাহ ইলেকট্রন চলাচলের দরুনই হয়ে থাকে। এটা জানা কথা যে, একটি সূক্ষ্ম তার অপেক্ষা একটি মোটা তারে বেশি প্রবাহ চলে। একটি মোটা তারে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি বলেই এটা হয়। দুই বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রন

পার্থক্যের দরুন ইলেকট্রনের সমতা রক্ষার্থে সংযোগকারী তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহে ইলেকট্রনের এ ধরনের পার্থক্যকে 'বিদ্যুৎ-চাপ-পার্থক্য' বলা হয়ে থাকে। ব্যাটারি 'বিদ্যুৎ-চালক বল' হিসেবে কাজ করে। ব্যাটারি প্রান্তদ্বয়ের সংযোগকারী কঠিন পদার্থের ইলেকট্রন যদি সহজে মুক্ত করা সম্ভব হয় তবেই তো এই ইলেকট্রন প্রবাহের দরুন বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে পারে। তামার মতো পরিবাহী পদার্থের ইলেকট্রন প্রায় মুক্ত অথচ অপরিবাহীর ইলেকট্রন মুক্ত করতে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করতে হয়।

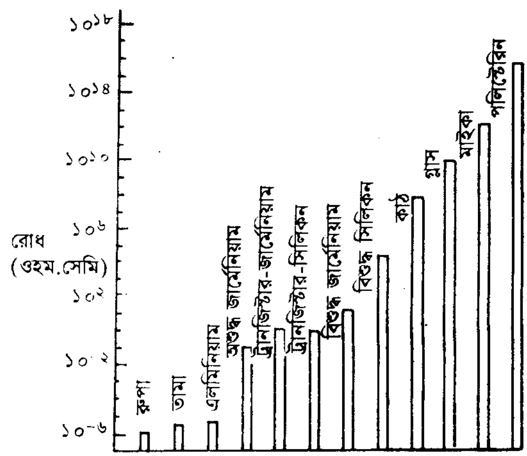

[চিত্র-৪.২]

কোন কঠিন পদার্থ পরিবাহী হবে কি হবে না তা নির্ভর করবে ল্যাটিস সজ্জার উপর। কার্বনের উদাহরণই ধরা যাক। কার্বনের দুইরূপ—গ্রাফাইট ও হীরক। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি শুধুমাত্র ল্যাটিস-লজ্জা ভিন্নতর হওয়াতে গ্রাফাইট ও

হীরকের বিদ্যুৎ রোধ ক্ষমতার মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়ে থাকে। গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে কার্বন পরমাণু ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কার্বন পরমাণুর মধ্যে বন্ধনী শক্তি খুবই কম। কার্বনের বহিঃস্থ কক্ষের চারটি যোজনী ইলেকট্রনের মধ্যে মাত্র তিনটি অন্যান্য পরমাণুর সাথে মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ। অবশিষ্ট ইলেকট্রনটি অপেক্ষাকৃত মুক্ত এবং সহজেই তা কেলাসে চলাচল করতে পারে। অথচ হীরকে প্রতিটি কার্বন পরমাণুর চারটি যোজনী ইলেকট্রন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কার্বন পরমাণুর সাথে চারটি সমান শক্তির ইলেকট্রন বন্ধনীর সৃষ্টি করে। ফলে পরমাণুতে মুক্ত ইলেকট্রন না থাকায় এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে পারে না। তাই হীরক হচ্ছে কুপরিবাহী অথচ গ্রাফাইট অর্ধপরিবাহী (semiconductor)।

পূর্ব পৃষ্ঠার চার্ট (চিত্র. ৪·২) থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর রোধ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

কেলাসের বৈদ্যুতিক গুণাবলীর মধ্যে 'পাইরোইলেকট্রিক' (pyroelectric) ও 'পাঈজোইলেকট্রিক (piezoelectric) ধর্ম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধুনা শিল্পক্ষেত্রে এ গুণাবলী যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

পাইরোইলেকট্রিসিটি

কোন কেলাসকে যদি তার বর্তমান পরিবেশ থেকে আলাদা উষ্ণতার পরিবেশে রাখা হয় তবে এর বিশেষ দুই দিক বৈদ্যুতিক চার্জ প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের ঘটনা সর্বপ্রথম টুর্মালিন কেলাসে পরিলক্ষিত হয়। পজিটিভ চার্জ প্রাপ্ত প্রান্তকে 'এনালোগাস্ মেরু' (+) আর বিপরীত প্রান্তকে 'এন্টিলোগাস মেরু' (—) বলা হয়। পজিটিভ প্রান্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সব ধরনের কেলাসে এই ধর্ম লক্ষ্য করা যায় না। টারটারিক এসিড কেলাসে এ গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

পাঈজোইলেকট্রিসিটি

যান্ত্রিক বল প্রয়োগের দ্বারা কেলাসের প্রসারণ ও সঙ্কোচন হতে পারে। এভাবে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে কোন কেলাস খণ্ডের পরস্পর বিপরীত পৃষ্ঠ দুটিতে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের সৃষ্টি হয়। সঙ্কোচনের সময় যে পৃষ্ঠে নেগেটিভ

চার্জের সৃষ্টি হয় প্রসারণের সময়ে ঐ একই পৃষ্ঠে পজিটিভ চার্জের সৃষ্টি হবে। একে পাঈজো-ইলেকট্রিক ক্রিয়া' বলা হয়। কোয়ার্জ কেলাসের এরূপ বৈদ্যুতিক গুণ আছে বলে একে 'পাঈজো ইলেকট্রিক' বলে। আবার দেখা গেছে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রেরপ্রভাবে কেলাসের প্রসারণ ও সঙ্কোচন হয়ে থাকে—একে 'উল্টো পাঈজো

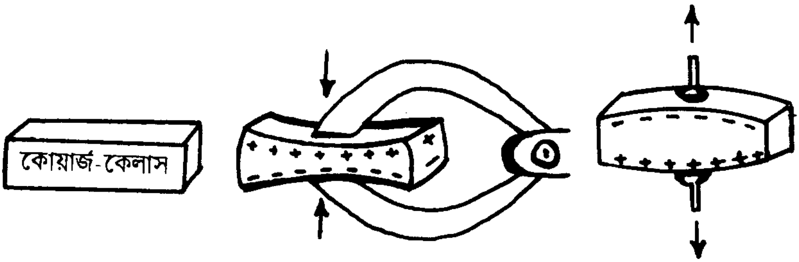

[চিত্র ৪.৩]

ইলেকট্রিক ক্রিয়া' বলে। কোয়ার্জ ও রচিলী সল্ট (rochelle salt) হলো 'পাঈজো-ইলেকট্রিক' কেলাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক সেন্টিমিটার পুরু রচিলী সল্ট কেলাসে ৩০০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ করলে এর আকার এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ বাড়ে বা কমে।

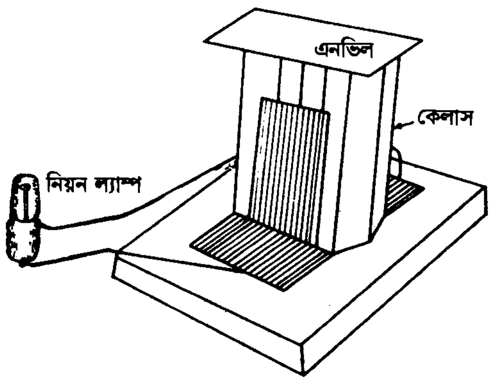

[চিত্র ৪.৪]

সঙ্কোচন-প্রসারণের দ্বারা আকারের পরিবর্তন হয় বলেই কেলাসের পরমাণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে। এই পরমাণুগুলি যদি 'আয়ন' হয় তবে এটা স্পষ্ট যে চার্জ তার স্থান পরিবর্তন করছে। কাজেই চার্জের নড়াচড়ার জন্যই যে আমরা কেলাসের এ ধরনের গুণ লক্ষ্য করি তা বলাই বাহুল্য। 'পাইজো ইলেকট্রিক ক্রিয়া' সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। এলুমিনিয়ামের পাতলা পাত দিয়ে দুটি পাতলা ইলেকট্রোড বানিয়ে নাও। এখন ভ্যাসেলিন দিয়ে ইলেকট্রোড দুটিকে রচিলী সল্টের পরস্পর বিপরীত দিকে লাগিয়ে দাও। পরে আঠালো ফিতা দিয়ে একখণ্ড কাঠের সাথে সংযুক্ত কার্ডবোর্ডের উপর একে স্থাপন কর। কম শক্তির নিয়ন বাতির প্রান্ত-সংযুক্ত তার দু'টিকে এলুমিনিয়াম ইলেকট্রোডগুলির সাথে জড়িয়ে নাও। এবার কেলাসের উপরে কার্ড বোর্ড কুশন লাগিয়ে তার উপর একটি এনভিল অর্থাৎ পেটানোর জন্যে লৌহখণ্ড রাখ। হাতুড়ি দিয়ে এনভিলে আঘাত করার মুহূর্তে নিয়ন ল্যাম্প ফ্লাশ হতে দেখবে। এই ভাবেই পাঈজোইলেকট্রিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যায়।

কেলাসের এই উভয় গুণকে প্রযুক্তি বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। গুলি বের করার সময়ে বন্দুক নলে সৃষ্ট চাপ নির্ণয়, বেতার প্রেরক যন্ত্রে উৎপন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সঠিক রাখার কাজে এবং সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে 'পাঈজোইলেকট্রিক' কেলাস অহরহ ব্যবহৃত হচেছ। ডাইরেক্টেড (directed) বেতার সঙ্কেত (অর্থাৎ যে গ্রাহক যন্ত্রের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত পাঠানো হয় শুধু সেটিই সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারবে এমনভাবে উৎপন্ন সঙ্কেত) পাঠানোর কাজে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

চৌম্বক গুণাবলী

তোমরা নিশ্চয়ই কোন চুম্বক-দণ্ড দেখেছ ও তা দিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা করেছ। চুম্বক-দণ্ড লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতব পদার্থকে আকর্ষণ করে থাকে। অনেক সময় দোকানীরা চুম্বক দিয়ে নিকেল-তৈরি টাকা, আধুলি ইত্যাদি মুদ্রাকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকে। আবার কোন চুম্বক-দণ্ডকে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে তার দুইপ্রান্ত উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ঝুলে থাকে। হাত দিয়ে অন্য দিকে সরিয়ে দিলেও তা হাত সরিয়ে নেবার সাথে সাথে ঠিক আবার উত্তর-দক্ষিণ দিকে ফিরে যায়। উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে ঝুলে থাকা, বিভিন্ন

ধাতুকে আকর্ষণ করা এবং পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ এগুলি চুম্বকের বিশেষ ধর্ম।

আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থেল্‌স নামের একজন গ্রীক পণ্ডিত ম্যাগনেটাইট নামক খনিজ পদার্থের মধ্যে চুম্বকের এ সমস্ত গুণ প্রথম লক্ষ্য করেন। কথিত আছে এ সময় ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে মেগনেস নামে এক মেষপালক ছিল। ভেড়া চড়াবার জন্য সে একটি লোহা পেঁচানো ছড়ি ব্যবহার করত। মেষ চড়াতে চড়াতে একদিন সে দেখতে পেল যে অদ্ভুত আকারের একটি কালো পাথর ছড়ির গোড়ায় লেগে রয়েছে। পরে এ ধরনের আরো খনিজ পদার্থ পাওয়া গেলে এগুলিকে তার নামানুসারে মেগনেটস নাম দেওয়া হয়। প্রায় পৌনে চারশত বছর আগে উইলিয়াম গিলবার্ট বলেন যে পৃথিবী বিরাট আকারের একটি চুম্বক। প্রাচীনকালে নাবিকেরা দিক-দর্শনের জন্য চুম্বক লোড-স্টোন বা খনিজ ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4) ব্যবহার করতেন।

পরবর্তী যুগে মানুষ লোহা থেকে চুম্বক তৈরির কৌশল আয়ত্ত করেছে। সে যাই হোক, কঠিন পদার্থের চৌম্বক-গুণাবলী আজ আমাদের বহু কাজে লাগছে। চুম্বকের সাহায্যে বিশেষ পন্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদন চুম্বকের সবচেয়ে দরকারি ও মূল্যবান আবিষ্কার। চৌম্বক পদার্থের সাহায্যে শুধুমাত্র আমেরিকায় তিনশ' কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সুষ্ঠু বিতরণ, শব্দ ও ছবি পুনরুৎপাদন, তথ্য-সংরক্ষণ, দরজার খিল, স্পিডোমিটার ঘুরানো প্রভৃতি কাজে আজ অহরহ চুম্বক-পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে চুম্বকের যথার্থ উৎকর্ষতার দ্বারা রেফ্রিজেরেটরের খিল থেকে শুরু করে কম্পিউটারের 'মেমোরি' পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। চল্লিশ বছর আগে লোকে জানতো না কেন কিছু পদার্থ চুম্বকধর্মী আর কেনই বা অন্যগুলি নয়। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের অনেক তথ্য মানুষের জানা থাকলেও বহু প্রশ্ন এখনও অজানা রয়ে গেছে।

আলোক সম্বন্ধীয় গুণ

কেলাসের আলো সম্বন্ধীয় ধ্রুবগুলি (optical constants) ভূতত্ত্ববিদদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ছোট ছোট শিলা খণ্ড পরীক্ষা ক'রে তাদের গঠন নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে আলোক সম্বন্ধীয় গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল।

হীরকের ঔজ্জ্বল্যই এর সৌন্দর্য বাড়িয়েছে এবং এটাই এর আকর্ষণের সর্বপ্রধান কারণ। হীরকের আলোক সম্বন্ধীয় গুণাবলী এমন যে, যখন এটিকে যথোপযুক্তভাবে কাটা হয় তখন চোখের কাছে প্রতিফলিত আলোর ঔজ্জ্বল্য এবং হীরকের ভিতরের আলোর খেলা অন্য যে কোন রত্নের চেয়ে বেশি হয়। আলো যখন বায়ু থেকে অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে যায় তখন এটির গতি শ্লথ কিংবা দ্রুত হতে পারে। বায়ু থেকে আলো হীরকে প্রবেশ করলে এর গতি খুবই কমে যায়। আলো বায়ু থেকে পানি, কাঁচ বা অন্য যে কোন পদার্থে ঢুকলে তার গতি যে পরিমাণ কমে, হীরকে তার চেয়ে অনেক বেশি কমে। বৃষ্টির পরে বা ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যেই যদি রৌদ্র থাকে তা' হলে কখনও কখনও আকাশে রংধনু দেখা যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি রঙ্গীন বৃত্তচাপ বা ধনুর সমষ্টি। আর রংগুলি ঠিক বর্ণালীর ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে। আকাশে ভাসমান পানিকণার দ্বারা আলোক রশ্মি প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের ফলেই রংধনুর উৎপত্তি হয়। ধর, কোন উপায়ে আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো হীরক বর্ষণ হ'লো। আর তার ফলে যে রংধনুটি সৃষ্টি হবে তার প্রভাব, সাধারণ পানির রংধনুর দীপ্তির চাইতে অনেক অনেক গুণে সুন্দর হবে—এই উজ্জ্বল রংয়ের রংধনু এতই প্রশস্ত হবে যে তা' আকাশকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলবে।

কেলাস পদার্থের আলোক সম্বন্ধীয় বহু গুণ রয়েছে। এ সমস্ত গুণকে নানাভাবে মানুষের কাজে লাগানো হয়। কেলাসের অতি পাতলা ঝিল্লির (thin film) এ ধরনের একটি গুণ 'কারেন্সি নোট' এর নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে। জাল নোট তৈরি করে কোন দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া যায়। একারণে বাংলাদেশের পুলিশ জালনোট তৈরির আস্তানা সম্পর্কে মাঝে মধ্যে তৎপরতা চালায়। ১৯৯০ সালের মার্চ এর শেষের দিকে এ তৎপরতার অংশ হিসাবে রাজশাহী শহরের কাজলায় তারা একটি আস্তানার সন্ধান পায়। খবরে বলা হয় এ আস্তানা থেকে দু'কোটি টাকার পাঁচশত টাকার নোট জাল করার মতলব ছিল। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে এ আস্তানা থেকে তৈরি কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। দেশের অর্থনীতিকে পংগু করার এ ধরনের চক্রান্ত প্রায়ই উদ্‌ঘাটিত হয়। বিদেশেও এধরনের জালিয়াতির পিছনে পুলিশকে বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রতি (ডিসেম্বর, ১৯৮৯) ব্যাংক অব কানাডা ৫০

ডলারের নোটে 'অপটিক্যাল' নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে যে বৃটেন এবং আমেরিকাও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে পড়েছে।

এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেলাসের 'পাতলা সর, আঁশ বা ঝিল্লি' প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। এই পদ্ধতিতে কাগজের নোটের উপরের বাম কোনায় একটি আয়তাকার পাতলা প্রলেপ বা দাগ থাকে। নোটটিকে একটু হেলালে যদি এই প্রলেপের রং সোনালী থেকে সবুজ এবং বিপরীত দিকে ঘোরাল যদি সবুজ থেকে সোনালী রং দেখা যায় তবে নোটটি জাল নয়—খাঁটি।

তোমরা হয়তো অনেকেই সাবান পানির বুদ্বুদে রংয়ের সমাবেশ দেখে থাকবে। সাবান পানির বুদ্বুদ ছাড়াও পানিতে তেলের পাতলা সরে, ফড়িং বা অনান্য প্রাণীর পাতলা পাখায় রোদ পড়লে যেভাবে রংয়ের সমাবেশ দেখা যায় একইভাবে নোটে অবস্থিত ব্যতিচারের (interference) জন্য এই রং দেখা যায়।

নোটে দৃশ্যমান রং ও তার তীব্রতা প্রলেপের গঠন ও গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। কানাডীয় পদ্ধতিতে জিরকনিয়াম অক্সাইড ও সিলিকন অক্সাইডের পালাক্রমে সাজানো পাঁচটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তর চুলের যে ব্যাস তার দশভাগের একভাগের সমান পুরু (০.৫ মাইক্রোমিটার)। অতি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত কৌশল দ্বারা বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে এই স্তরগুলি জমা করা হয়। পরে বিশেষ এক পদ্ধতির মারফত ছাপানো নোটে তা দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন করা হয়। এতে ৫০ ডলার নোটে যে অতিরিক্ত খরচ হয় তার পরিমাণ মাত্র আড়াই সেন্ট — অর্থাৎ নোটের যে মান তার দু'হাজার ভাগের একভাগ। নখ বা অন্য কিছু দিয়ে আঁচড় দিলে, শুষ্ক অবস্থায় ধৌত বা ইস্তিরি করলে, রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে নিয়ে এলে, মোচড়ালে বা কয়েক বছরের পুরাতন হলেও এই নিরাপত্তা প্রলেপের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে। কানাডা ১৯৯২ খ্রিঃ নাগাদ সব মূল্যমানের নোটে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্পন্ন করবে।

যখন কোন স্বচ্ছ প্লেটের উপর একটি আলোক-রশ্মিগুচ্ছ এসে পড়ে তখন এর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয় আর কিছু অংশ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়। আপতিত রশ্মি দুটি মাধ্যমের বিভেদ-তলের লম্বের সাথে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে 'আপতন কোণ' এবং অনুরূপভাবে প্রতিসরিত রশ্মি এই লম্বের সাথে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে 'প্রতিসরণ কোণ' বলা হয়। দেখা যায়, আপতন ও প্রতিসরণ

কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুবক—এটিই 'প্রতিসরণের নিয়ম'। এই ধ্রুবকের নাম হলো 'প্রতিসরাঙ্ক'। কঠিন স্বচ্ছ পদার্থ ও কেলাসের প্রতিসরাঙ্ক একে অপরের থেকে আলাদা। যেমন ক্রাউন কাচের প্রতিসরাঙ্ক ১.৫ অথচ হীরকের প্রতিসরাঙ্ক হলো ২.৪ এর কিছু বেশি। বাইনোকুলার, ক্যামেরা ইত্যাদি তৈরি করতে কাচের প্রয়োজন। কাচের গুণাগুণের কোন তারতম্য ঘটলে যন্ত্রের কাজের পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই এসব যন্ত্র ব্যবহারের আগে কাচের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য প্রতিসরাঙ্কের মান বের করে নিতে হয়।

অনেক কেলাস আছে যাদের মধ্যে দিয়ে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করলে তা দুই রশ্মিতে ভাগ হয়ে পড়ে। ক্যালাসাইট, কোয়ার্জ প্রভৃতি কেলাসে আলোকের এরূপ 'দ্বৈত-প্রতিসরণ' ঘটে। এই দুই রশ্মির মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। একে বলা হয় 'সাধারণ রশ্মি' ; আর অপরটি সাধারণ প্রতিসরণের নিয়ম মেনে চলে না—একে বলা হয় 'অসাধারণ রশ্মি'। এ ধরনের কেলাসের নিচে কোন বস্তু রেখে যদি উপর থেকে তাকানো যায় তা'হলে দুটি প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। প্রতিবিম্ব দুটির একটি সাধারণ রশ্মি ও অপরটি অসাধারণ রশ্মির জন্য। এখন যদি কেলাসকে আপতিত রশ্মি বেড়িয়ে ঘুরানো যায় তবে সাধারণ রশ্মির জন্য প্রতিবিম্ব একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকবে ; কিন্তু অসাধারণ রশ্মির জন্য প্রতিবিম্বটি একটি বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে থাকবে।

পানির তরঙ্গের সাথে পরিচয় আছে সকলেরই। স্থির পানিতে একটি ঢিল ফেললেই তরঙ্গ উঠতে থাকবে—স্থির অবস্থায় যে অনুভূমিক তল ছিল পানি তা হতে কিছু উপরে উঠে ও কিছু নিচে নামে। পানির প্রতিটি কণা অনুভূমিক তলের সাথে লম্ব দিকে সরল দোলগতি রচনা ক'রে চলে। একে বলা হয় 'তির্যক কম্পন'। একই ভাবে উৎস-বিন্দু হতে আলোক-শক্তি বিকীর্ণ হয়। একটি আলোক রশ্মি হলো আলোক শক্তি সঞ্চালনের অভিমুখ এবং তা' তরঙ্গ-মুখের সাথে লম্বভাবে থাকে। তাই আলোক তরঙ্গ পানির তরঙ্গের মতোই তির্যক তরঙ্গ। আলোক কণাগুলি যখন একটি তলে (অথবা এর সমান্তরাল তলে) কম্পিত হতে থাকে তখন তাকে 'আলোর সমবর্তন (polarization of light) বলে। আর একটি তলে বা সমান্তরাল তলে কম্পমান আলোককে 'সমবর্তিত আলোক' বলা হয়। সাধারণ আলোক অসমবর্তিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও কম্পন রশ্মির গমন পথের সাথে সমকোণে ক্রিয়া করে সত্য কিন্তু কম্পনের অভিমুখ প্রতি সেকেণ্ডে বহুবার

উষ্ণতা সাধারণ তাপমাত্রার নিচে হলে পরমাণু তার গতিশীলতা প্রায় হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন তাপমাত্রায় পদার্থের এরূপ আচরণ বিদ্যুৎ পরিবাহিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

একটি ব্যাটারির দুইপ্রান্ত একটি তামার তার দিয়ে যুক্ত করা হলে, যুক্ত করার সাথে সাথে তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এক ঝাঁক ইলেকট্রন তারের পরমাণুর মধ্য দিয়ে ছুটে যায়।* পরমাণুগুলি অনবরত নাচতে থাকায় ইলেকট্রনগুলিকে এদের মধ্য দিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হয়। এ অবস্থায় পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘর্ষ হয় এবং ফলে তারের রোধতাও বৃদ্ধি পায়। তারের তাপমাত্রা বাড়লে পরমাণুর কম্পন বেড়ে যায় এবং রোধতাও আরো বেশি হয়। কিন্তু তারকে যদি ঠাণ্ডা করা হয় তবে এর বিপরীতটাই ঘটে। অর্থাৎ তারের রোধতা কমে গিয়ে এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা ()K (–২৭৩°c) এর কাছাকাছি হলে ধাতুর পরিবাহিতা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছে এবং কোন কোন ধাতুর বেলায় তা' অসীম হয়—অর্থাৎ রোধতা শূন্য হয়ে যায়। এই অবস্থা ধাতুর 'অতিবাহিতা' (superconductivity) নামে পরিচিত। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কেমারলিং ওন্‌স অতিবাহিতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানতে পারেন। তাপমাত্রা ()K এর কাছাকাছি হলে পরমাণুর কম্পন (বা অস্থিরতা) সর্বনিম্ন স্তরে পৌছে —ফলে সব ইলেকট্রন বাধাহীন ও সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল করতে পারে বলেই এক্ষেত্রে ধাতু অতিমাত্রায় পরিবাহী হয়ে উঠে। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আশিটি এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে একশ'র কিছু বেশি 'অতিবাহী'র অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কিন্তু আজ আমরা ২৪টি মৌলিক ধাতু ও প্রায় এক হাজারটি যৌগিক (সঙ্কর) ধাতুকে 'অতিবাহী' হিসেবে জানি। শুনে আশ্চর্য লাগবে যদি আমরা অতিবাহী ধাতুর (বা সঙ্কর ধাতুর) রিং তৈরি করে তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহর ব্যবস্থা করি তবে অনন্তকাল ধরে এই প্রবাহ চলতে থাকবে। অথচ সাধারণ তাপমাত্রায় ঐ একই ধাতু নির্মিত রিং দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ রোধতার জন্য আস্তে আস্তে কমে যাবে। আমেরিকায় এক গবেষণাগারে অতিবাহীর এক রিং দিয়ে কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলছে।

আসলে একই ইলেকট্রন তারের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ভ্রমণ করে না ; বরং বিদ্যুৎ চাপের প্রভাবে পরমাণু ইলেকট্রন মুক্ত হ'য়ে চলার পথে তার পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। সেটি আবার পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ইলেকট্রনকে মুক্ত করে। এ প্রক্রিয়ায় তার-মধ্যস্থিত অসংখ্য ইলেকট্রন আলোর গতিতে ছুটে চলেছে বলে মনে হবে।

কিছু সংখ্যক ধাতু (বা সঙ্কর ধাতু) অতিবাহী অথচ অন্যগুলি তা' নয় কেন এ সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে শুধুমাত্র বলা যায় ঃ

(ক) ধাতুই (বা সঙ্কর ধাতুই) কেবল অতিবাহী,

(খ) কোন 'ফেরোম্যাগনেটিক' বা 'এন্টিফেরোম্যাগনেটিক' পদার্থ অতিবাহী নয় ; এবং

(গ) যোজনী ইলেকট্রন সংখ্যা ২ থেকে ৮ হ'লে সে-সব ধাতব-মৌলিক পদার্থগুলি অতিবাহী।

যে তাপমাত্রায় ধাতু (বা সঙ্কর ধাতু) তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অতিবাহী হয়ে উঠে তাকে 'সঙ্কট তাপমাত্রা' (T_c) বলে। চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে এই তাপমাত্রা পদার্থের আকার-আয়তনের উপর নির্ভর করে না। কতকগুলি অতিবাহী পদার্থের সঙ্কট তাপমাত্রার মান এখানে দেওয়া হলো ঃ

মৌলিক পদার্থ	$T_c(K)$	মৌলিক পদার্থ	$T_c(K)$
এলুমিনিয়াম	১·১৯৬	টাংস্টেন	০·০১২
ক্যাডমিয়াম	০·৫৬০	দস্তা	০·৮৭০
গ্যালিলিয়াম-γ	৭·৬২০	সিজিয়াম*	১·৭
ইন্‌ডিয়াম	৩·৪০৪	জার্মেনিয়াম*	৪·৮৫–৫·৪
সীসা	৭·১৯৩	সেলেনিয়াম-II*	৬·৭৫–৬·৯৫
পারদ-α	৪·১৫৪	সিলিকন*	৭·৯
নায়োবিয়াম	৯·২৬০		
ট্যানটালাম	৪·৪৮৩	* শুধুমাত্র অতি উচ্চ বায়ু-চাপে এগুলি	
টিন	৩·৭২২	অতিবাহীতে পরিণত হয়।	

কাজেই দেখা যাচ্ছে সঙ্কট-তাপমাত্রার মান খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে নায়োবিয়াম জার্মেনিয়াম যৌগিকে T_c এর মান ২৩·৩ K —এই মান যে কোন জানা সঙ্কট তাপমাত্রার চেয়ে বেশী। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে এই যৌগিক আবিষ্কৃত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অতিবহিতা একটি নিম্ন তাপমাত্রার ঘটনা—শিল্প ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানে যথাযথ ব্যবহারে এই নিম্ন তাপমাত্রাই হলো এক বিরাট বাধাস্বরূপ। কেননা

অতিবাহী সাজসরঞ্জামের জন্য সব সময় হিমায়ন যন্ত্রপাতির (refrigeration) প্রয়োজন পড়বে।

আমরা জানি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শত শত মাইল দূরে তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে তারের রোধতার জন্য বিদ্যুৎ শক্তির যথেষ্ট অপচয় হয়। অতিবাহী তারের সাহায্যে এই সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলে বিদ্যুৎ শক্তির কোনই অপচয় হবে না। সাধারণ তাপমাত্রায় এ রকম অতিবাহী আবিষ্কৃত হলে সেটি হবে একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং ব্যবসায়িক দিক দিয়ে খুবই আকর্ষণীয়। উচ্চতাপমাত্রায় অতিবাহী পদার্থ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। তাঁরা এজন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন এবং নিত্য নতুন এ ধরনের পদার্থ তৈরি করে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করতে থাকেন। এ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৭০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত দীর্ঘ তের বছরেও ২৩.৩ K এর বেশি তাপমাত্রার কোন অতিবাহী বস্তুর সন্ধান মেলেনি।

জুরিখে IBM গবেষণাগারে কর্মরত অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী আলেক্স মূলারের অতিবাহী পদার্থের উপর গবেষণা কয়েকবছর ধরে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। তিনি নতুন পদার্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এসময় তাঁর সহযোগী ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুন জার্মান বিজ্ঞানী জর্জ বেদনোর্জ। ইন্টারমেটালিক যৌগ বাদ দিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তাঁরা ধাতব অক্সাইড নিয়ে কাজ শুরু করেন। নির্ধারিত গবেষণা কাজের ফাঁকে তাঁরা কোম্পানির অগোচরে এ কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৮৬ খ্রীঃ তাঁরা তাঁদের প্রথম সফলতা দেখেন—তাঁরা ল্যান্থানাম, স্ট্রনশিয়াম ও তামার অক্সাইড নামক সিরামিক পদার্থে ৩৫ K তাপমাত্রায় অতিবাহিতার সন্ধান পান। যদিও পূর্বের রেকর্ডের চেয়ে এই তাপমাত্রা মাত্র ১২ K উপরে তবুও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা তাঁদের এই অভিনব চিন্তাধারা অতিবাহী গবেষণায় বন্ধাত্বের অবসান ঘটিয়েছে। এবং সঠিক পথের সন্ধানের মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর ফলশ্রুতিতে হঠাৎ করে সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গেল—মনে হলো সাধারণ তাপমাত্রায় অতিবাহী বস্তুর সন্ধানের আর খুব একটা দেরি নেই। বিশ্বখ্যাত নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো —স্মরণকালের কম সময়ের মধ্যে জর্জ বেদনোর্জ ও আলেক্স মূলারকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হলো। এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই

বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকটি গবেষণাগার থেকে ৯০ K ও আরো উচ্চ তাপমাত্রায় অতিবাহী বস্তুর সন্ধানের কথা জানানো হলো কিন্তু এ ধরনের দাবি খুব বেশি দিন টিকেনি। তবে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে আরেকটি সাফল্যের খবর বেরিয়েছে-– তা' হলো ১২৫ K তাপমাত্রায় নতুন এক অতিবাহী বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে বেদনোর্জ ও মূলারের গবেষণার জন্য যে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে তা' সত্যিই আশাব্যঞ্জক।

শক্তিশালী চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে ধাতুর অতিবাহিতার গুণ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। এই তথ্য ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। কম্পিউটারের অতিদ্রুত সুইচিং ব্যবস্থার (high speed switching device) জন্য এটি এক অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার। চৌম্বক–ক্ষেত্র 'অফ' করলে অতিবাহীতে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে তা চৌম্বক–ক্ষেত্র 'অন' করার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে অতিবাহী উচ্চরোধ ক্ষমতার ধাতুর মত কাজ করে।

এরপরে আমরা দেখবো একটি ট্রানজিস্টার কিভাবে সঙ্কেত অ্যামপ্লিফায়ার বা বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে। কম তাপে ট্রানজিস্টার পরমাণুর গতিশীলতা একদম কমে যায় ; ফলে বিবর্ধক হিসেবে ব্যবহারের সময় এ থেকে অযথা কোন গণ্ডগোল (noise) সৃষ্টি হতে পারে না। তাই তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রায় (অর্থাৎ -২৬৯ °C) ট্রানজিস্টার ক্ষীণতম সঙ্কেতও বিবর্ধন করতে সক্ষম হয়। টেলস্টারের ভূ-গ্রাহক যন্ত্রও একই নীতিতে কাজ করে। এখানে ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ারে ব্যবহৃত রুবি কেলাসকে তরল হিলিয়াম তাপমাত্রায় রাখা হয়।

পাঁচ

কেলাসের ব্যবহার

কেলাসিত পদার্থ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। বিশ্ব প্রকৃতির ভাণ্ডার হতে নতুন নতুন পদার্থ আবিষ্কার করেই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হননি, বরং এ সমস্ত বস্তুর ধর্ম, প্রকৃতি ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ফলে নতুন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে নবতর আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞান জগৎ আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। পরে আবার এ সমস্ত গোছানো জ্ঞানই কঠিন পদার্থের নতুন নতুন ব্যবহারিক প্রয়োগ উদ্ভাবন করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। তাই জীবনের বহু ক্ষেত্রেই এদের নবতর ব্যবহারের সুফল আমরা অহরহ ভোগ করছি। নিচে কেলাসের শুধু কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কেলাস ঘড়ি

সাধারণ একটি ঘড়ি কিভাবে চলে তা আমরা মোটামুটি জানি। আজকাল বাজারে বৈদ্যুতিক ঘড়ি পাওয়া যায়। এ সমস্ত ঘড়ি সাধারণত বৈদ্যুতিক মেইন হতে প্রাপ্তব্য পরিবর্তী প্রবাহের (Alternating Current) ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সিন্‌ক্রোনাইজ্‌ড বা সমলয়ীকৃত। পরিবর্তী প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ বার আবর্তিত হয় এবং এটির দ্বারা সিন্‌ক্রোনাস বা সমকালবর্তী মটর চালিত হয়। মটরের একটি যন্ত্রাংশ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ (এর গুণিতক বা অর্ধগুণিতক) বার ঘোরে। এই আবর্তনের পরিবর্তী প্রবাহ যখন ঘড়ির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখনই সেকেণ্ডের কাঁটা এক সেকেণ্ড পরিমাণ ঘোরে। পরিবর্তী প্রবাহের কম্পন যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ বারের কম বা বেশি হয় তবে ঘড়ি 'স্লো' বা 'ফাস্ট' চলবে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পক্ষে পরিবর্তী প্রবাহের ফ্রিকোয়েন্সি সব সময় ৫০ রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। কাজেই এ ধরনের ঘড়ি সঠিক সময় দিতে পারে না বলে একে আদর্শ হিসেবে ধরা যায় না।

এবারে এমন একটি ঘড়ির কথা বলা হবে –যেটি প্রতি চার বছরে মাত্র এক সেকেণ্ড 'স্লো' বা 'ফাস্ট' হতে পারে। এটি হলো কোয়ার্জ কেলাস ঘড়ি। প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ আবর্তের মেইন পরিবর্তী প্রবাহ ব্যবহারের পরিবর্তে এখানে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আবর্তের প্রবাহ ব্যবহার করা হয়। এবং এ রকম ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তী প্রবাহ কেলাসের সাহায্যে পাওয়া যায়। এই আবর্তের মান ধ্রুব। তাই ঘড়িও নির্ভুল সময় দিতে পারে।

এখন কিভাবে কেলাস উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির প্রবাহ সৃষ্টি করে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। কেলাস ঘড়ির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে কোয়ার্জ কেলাস। এখানে পরমাণুগুলি এমনভাবে সাজানো যে, বিশেষ অবস্থায় এরা 'পাঈজো-ইলেকট্রিক' গুণ প্রাপ্ত হয়। আর এ গুণের জন্যই, কোয়ার্জকে যদি সঙ্কোচন করা হয়, তবে এর পরমাণুগুলি এমনভাবে স্থান পরিবর্তন করে যে, নেগেটিভ চার্জগুলি কেলাসের একদিকে এবং পজিটিভ চার্জগুলি তার উল্টোদিকে জড়ো হয়। সুতরাং কেলাসকে বারবার সঙ্কোচন এবং প্রসারণ করালে এর পরস্পর বিপরীত দিকে পালাক্রমে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন যদি ব্যাটারির সাহায্যে কেলাসের একদিকে পজিটিভ

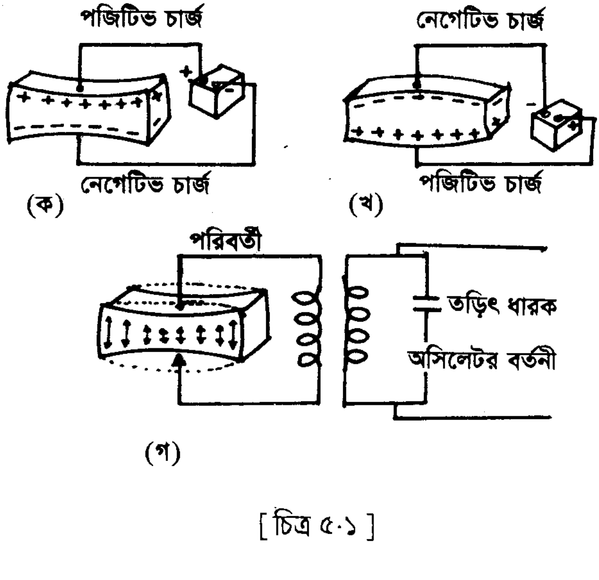

[চিত্র ৫·১]

চার্জ ও বিপরীতদিকে নেগেটিভ চার্জ দেওয়া হয় তবে কেলাসটি আপনা–আপনি (ক) এর মতো সঙ্কুচিত হবে। লক্ষণীয় যে, এখানে কোন রকম যান্ত্রিক বল প্রয়োগ করা হয়নি। এখন যদি ব্যাটারি টার্মিনাল উল্টো করে দেওয়া হয়, তবে কেলাস আপনা আপনি (খ) এর মতো প্রসারিত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যান্ত্রিক সঙ্কোচনের দ্বারা বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি আর বৈদ্যুতিক চার্জ দ্বারা কেলাসের যান্ত্রিক সঙ্কোচন করা যায়।

কেলাসের পরস্পর বিপরীত দিকে সংযুক্ত ধাতব প্লেট দুটিকে যথাযথ নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে যুক্ত করলে কেলাসটি ঐ ফ্রিকোয়িন্সিতে দুলতে থাকবে (চিত্র ৫.১গ দ্রষ্টব্য)। তবে লক্ষণীয় যে, সব ফ্রিকোয়েন্সিতে কিন্তু কেলাস দুলবে না। অবশ্য কেলাসের আয়তন এবং কিভাবে এটি সংযুক্ত তার উপর ঐ কম্পনের মান নির্ভর করবে।

আগেই বলা হয়েছে, ঘড়ির জন্য ব্যবহৃত কোয়ার্জ কেলাসকে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ বার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করানো হয়। অস্‌সিলেটর বর্তনীর সাহায্যে এটি করা হয়। যে ফ্রিকোয়েন্সিতে কেলাস এরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে সক্ষম ঠিক সেই ফ্রিকোয়েন্সির প্রবাহের সাথে যুক্ত অবস্থায় কেলাসটি অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দুলতে থাকে। কেলাসের এই ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয় না ; কিন্তু অস্‌সিলেটর বর্তনীর কম্পনের হার পরিবর্তিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কেলাস এই ফ্রিকোয়েন্সিকে সাথে সাথেই পূর্বের নির্দিষ্ট মানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। অস্‌সিলেটর বর্তনীর কাজ হলো কেলাসে শক্তি সরবরাহ করা আর কেলাসের কাজ হলো অস্‌সিলেটর বর্তনীর ফ্রিকোয়েন্সি যাতে পরিবর্তিত না হয় সেটা দেখা।

উপরোক্ত বর্তনীর সাথে সংযুক্ত কয়েকটি বৈদ্যুতিক বর্তনী এই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির হারকে সঠিক ভাবে কম ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তিত করে দেয়। নির্দিষ্ট মানের এই কম ফ্রিকোয়েন্সির প্রবাহ দিয়ে একটি সিন্‌ক্রোনাস মটর চালিত হয় এবং তা' একটি ঘড়ির সঠিক সময় দিতে সক্ষম হয়।

রেকর্ডপ্লেয়ারে কেলাস

রেকর্ড–প্লেয়ারের সাহায্যে আমরা গান, বাজনা কিংবা অন্য কিছু শুনে আনন্দ পাই। রেকর্ড যন্ত্রের উপর রেখে চক্রাকারে ঘোরানোর সাথে সাথে একটি সূঁচও

রেকর্ডের খাঁজগুলিতে ঘুরতে থাকে, আর তারই ফলে আমরা রেকর্ডকৃত শব্দ শুনতে পাই।

একটি রেকর্ডকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে তাতে খাঁজ কাটা আছে। আর এই খাজগুলি তরঙ্গায়িত। রেকর্ড তৈরি এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয় প্লাস্টিকের তৈরি রেকর্ড একটি ঘুরন্ত টেবিলে রাখা হয়। পাতলা ডায়াফ্রামের সাথে সংযুক্ত একটি গরম সুঁচের অগ্রভাগ উক্ত প্লাস্টিকের রেকর্ডের উপর লাগানো হয়। ডায়াফ্রামের সামনে কথা বা গান গাইলে ডায়াফ্রামের কম্পনের সাথে সাথে গরম সুঁচটি সামনে পিছনে নড়তে থাকে। রেকর্ড ঘোরার সাথে সাথে সুঁচের ঘায়ে তাতে খাজ কাটা হতে থাকে, আর সুঁচটি অনবরত ঘুরে উপরোক্তভাবে রেকর্ডের গায়ে খাঁজ কাটতে কাটতে ক্রমেই রেকর্ডের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে চলে যায়। মূল রেকর্ডের একটি ছাঁচ তৈরি করে তাতে অনুরূপভাবে খাঁজ কাটা হয় আর এই ছাঁচ প্লাস্টিকের উপর চেপে ইচ্ছামতো মূল রেকর্ডের অনুলিপি তৈরি করা সম্ভব।

এই রেকর্ড দোকান থেকে কিনে যখন রেকর্ড প্লেয়ারে বাজানো হয় তখন ঠিক অনুরূপ একটি সুঁচ ডায়াফ্রামের সাথে একসঙ্গে গাঁথা থাকে। তরঙ্গের খাঁজে খাঁজে এই সুঁচের অগ্রভাগের ঘুর্ণনের সাথে সাথে ডায়াফ্রামে কম্পনের সৃষ্টি হয় ; ফলে রেকর্ডকৃত মূল শব্দ অবিকল শোনা যায়।

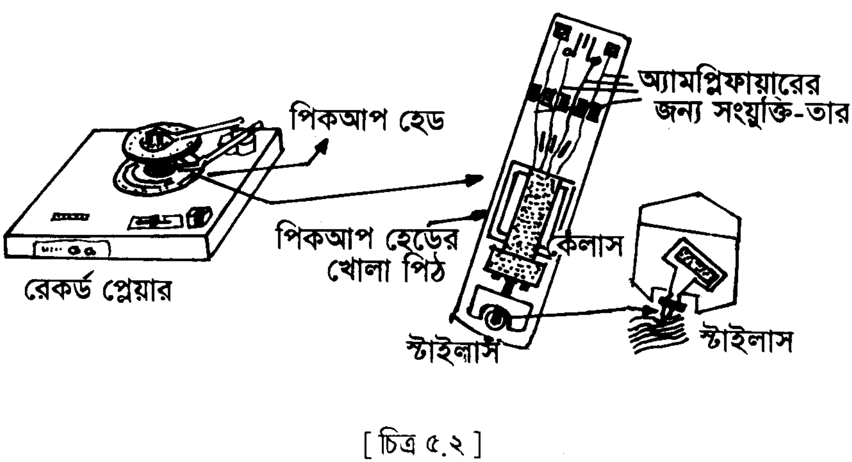

[চিত্র ৫.২]

আগের রেকর্ডপ্লেয়ারে স্টাইলাস বা সুঁচ সাধারণত কাঠ বা ধাতু দিয়ে তৈরি হতো। আর এটিকে একবার ব্যবহারের পরই বদলাতে হতো। আধুনিক রেকর্ড প্লেয়ারে হীরক বা অন্য কেলাস ব্যবহার করা হয়। সুবিধা হলো এই যে — এটি ধাতব সুঁচ থেকে বেশিদিন টিকে এবং রেকর্ডের কম ক্ষতি করে। এ ধরনের হীরক আজকাল অনেক সস্তায় তৈরি করা যায়।

রেকর্ডে সুঁচের কম্পন ও সরাসরি ডায়াফ্রামের কম্পনের মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করা হয় না। কম্পনকে প্রথমে বিদ্যুৎতাবেগে পরিণত করা হয় এবং তারপর এই বিদ্যুতাবেগ লাউডস্পীকারে ডায়াফ্রামের কম্পনের ফলে শব্দ সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ কম্পন সহজেই বিবর্ধন করা যায় বলে এই ব্যবস্থা আজকাল বহু রেকর্ডপ্লেয়ারে করা হয়। এই সুঁচ যান্ত্রিক উপায়ে একটা বিশেষ ধরনের 'পাঈজো-ইলেকট্রিক' কেলাসের সাথে লাগানো থাকে। যান্ত্রিক চাপ (সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ, মোচড়ানো বা বাঁকানো) দ্বারা এ ধরনের কেলাস থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়। উপর্যুপরি সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত করলে কেলাসের বিপরীত দিকে যথাক্রমে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ পাওয়া যায়। মোচড়ালে বা বাঁকালে একই ধরনের ফল পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে সুঁচের অগ্রভাগ আর কেলাস এক ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে বাঁধা থাকে। ফলে রেকর্ড ঘোরার সাথে সাথে সুঁচ খাঁজের আঁকা-বাকা পথে নড়তে থাকে এবং তরঙ্গায়িত দোলন কেলাসে যায়। ফলে কেলাসের উপর চাপের তারতম্যের দরুন বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। শব্দ থেকে প্রাপ্ত এই পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহকে রেকর্ডপ্লেয়ারের বিবর্ধক বর্তনীর সাহায্যে শক্তিশালী করা হয়। তারপর এই বিবর্ধিত সঙ্কেত রেকর্ড প্লেয়ারের লাউডস্পীকারে যায় এবং তা স্পীকারের ডায়াফ্রামে কম্পনের সৃষ্টি করে। এই ডায়াফ্রাম বায়ুকণাকে আন্দোলিত করে—এই আন্দোলন রেকর্ড করার সময় ডায়াফ্রামের সম্মুখের শব্দের ফলে সৃষ্ট আন্দোলনের মতোই ; তার ফলে অবিকল রেকর্ডকৃত শব্দই আমরা শুনতে পাই।

কেলাস গ্রাহক-যন্ত্র

বেতার যন্ত্র সভ্যতার এক নতুন যুগের সূচনা করে দিয়েছে। দূরের বাণী বিনা তারে ভেসে এসে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এবং সাথে সাথে বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতায় এনে দিয়েছে বিপ্লব। প্রেরক যন্ত্রের কাছে বসা মানুষ কোন শব্দ করার

সাথে সাথেই শত শত মাইল দূরের মানুষ তা শুনে ফেলে। কেলাস নির্মিত একটি অতি সাধারণ বেতার গ্রাহক যন্ত্র কিভাবে এ কাজ করে তা এখানে আলোচনা করা হবে।

অতি সহজেই একটি বেতার গ্রাহক-যন্ত্র একটি কেলাসের সাহায্যে তৈরি করা যায় (চিত্র ৫.৩ক)। কার্বোরাণ্ডাম, গ্যালিনা প্রভৃতি কেলাস এ কাজের জন্য উপযুক্ত। এ সমস্ত কেলাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য এরা পরিবর্তী প্রবাহের

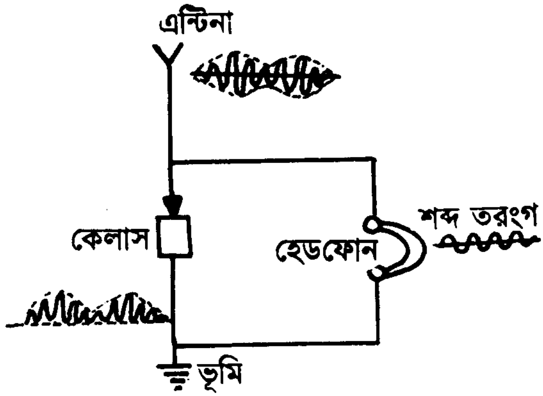

[চিত্র ৫.৩ ক]

রেক্টিফায়ার' বা একমুখীকারক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ একটি ধাতব সংযোগ বিন্দুর ভিতর দিয়ে এদের মধ্যে পরিবর্তী প্রবাহ চালনা করলে প্রবাহ অতি সহজেই একদিকে চলে। কিন্তু বিপরীত দিকে রেজিস্ট্যান্স বা রোধ বৃদ্ধি পায় বলে প্রবাহ বহুগুণে হ্রাস পায়। ফলে প্রবাহ শুধু একই দিকে হতে পারে।

প্রথমত, শব্দ-তরঙ্গকে (অডিও-ফ্রিকোয়েন্সির*) সাধারণ মাইক্রোফোনের সাহায্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয় (চিত্র ৫.৩ খ)। কম শক্তির এই

---

* যে ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ-সংকেত আমরা শ্রবণ করতে পারি সেই ফ্রিকোয়েন্সিকে অডিও-ফ্রিকোয়েন্সি বলে।

তরঙ্গকে অধিক ফ্রিকোয়েন্সির বাহক তরঙ্গের উপর সোয়ার করা হয়। এটি সম্পন্ন হয় 'মডুলেটর' নামক যন্ত্রের দ্বারা। শক্তিশালী এই সংমিশ্রিত তরঙ্গ আলোর গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে এই তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রের এন্টিনাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে।

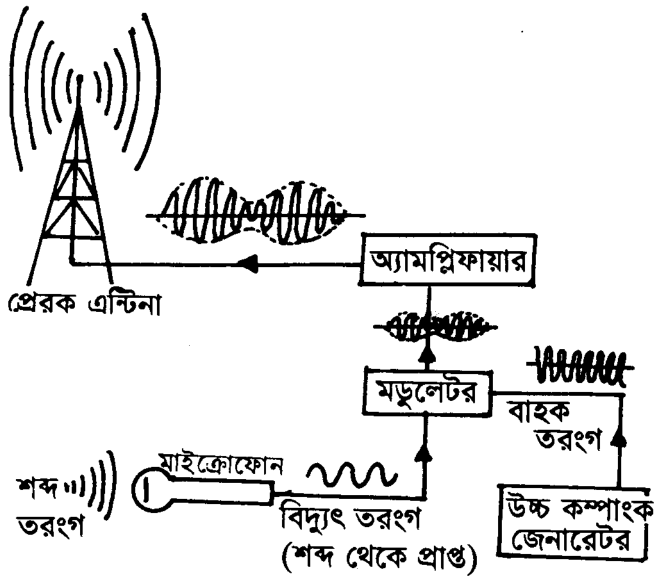

[চিত্র ৫.৩ খ]

কেলাসের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য কেলাসের ভিতর দিয়ে এন্টিনা হতে 'আর্থ' বা ভূমিতে প্রবাহিত তরঙ্গের চেহারা ৫.৩ ক চিত্রে দেখানো হয়েছে। একমুখীকারক হিসেবে কেলাস ভুমি-রেখার নীচের তরঙ্গকে দমন করে। একমুখী প্রবাহের গড় মানের কার্ভ প্রেরকযন্ত্রে মাইক্রোফোনের সম্মুখে ব্যবহৃত শব্দতরঙ্গের অনুরূপ। এভাবেই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির উপর সোয়ার করা কম ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ তরঙ্গকে ছেঁকে বের করা হয়। কাজেই কেলাসনির্মিত বেতার গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্য বাহক তরঙ্গকে দূর করে শুধু শব্দ তরঙ্গকে রাখা হয় এবং তা শেষ পর্যন্ত হেডফোনে শব্দে রূপান্তরিত হয়।

কেলাস লেজার

বহু আগেই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকগণ রশ্মি–বন্দুক (ray-gun), তাপ–তলোয়ার (sword of heat) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু এরও বহু বছর পরে মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ লেজার নামক এক তীব্র পারমাণবিক রশ্মি উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করেন। লেজার এমন অবিশ্বাস্য শক্তির তীব্র ঘনীভুত রশ্মি যে কঠিন ইস্পাতকে এটা অতি অল্প সময়ে ছিদ্র করে দিতে পারে। আবার একে এমন সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যা দিয়ে অক্ষিপটের সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা পর্যন্ত ঝালাই করে চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের হাগ্‌স রিসার্চ ল্যাবরেটরীর থিওডোর হাইমেন হলেন লেজারের আবিষ্কারক। তিনি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম রুবি কেলাস হতে লেজার রশ্মির উদ্ভাবন করেন। অবশ্য এর দু'বছর আগেই অন্য দু'জন বিজ্ঞানী শাওলো ও টাউন্স লেজারের তাত্ত্বিক তথ্য প্রকাশ করেন। এখানে ব্যবহৃত এই কেলাস আসলে ছিল এক প্রকারের কৃত্রিম রত্ন—সামান্য পরিমাণ ক্রোমিয়াম অক্সাইড মিশ্রিত এলুমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে তৈরি। আর এর আকৃতি ছিল নলাকার—লম্বায় দেড় হতে দু'ইঞ্চি এবং ব্যাসে এক–চতুর্থ ইঞ্চি।

এখন প্রশ্ন হলো লেজার কি? এবং কিভাবেই বা এটি উৎপন্ন করা যায়? লেজার হলো ইংরেজি শব্দ। আসলে এটি কয়েকটি শব্দের আদি অক্ষর নিয়ে গঠিত। LASER – এর বিভিন্ন অক্ষর নিচের শব্দগুলি থেকে নেয়া হয়েছে ঃ

L -- Light (আলো)
A -- Amplification (বিবর্ধন)
S -- Stimulated (উত্তেজিত)
E -- Emission (বিকিরণ)
R -- Radiation (রশ্মি)

কাজেই LASER আসলে LIGHT AMPLIFICATION by STIMULATED EMISSION of RADIATION অর্থাৎ উত্তেজিত বিকিরণের মাধ্যমে আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি।

পদার্থ কেলাসিত বা অন্য যে কোন অবস্থায় থাক না কেন তা' অসংখ্য পরমাণু নিয়ে গঠিত। আর এসব পরমাণুর রয়েছে নিজস্ব গুণাবলীর শক্তি স্তর (energy levels)। সাধারণত পরমাণু তার শক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় বা শক্তিস্তরগুলির সর্বনিম্নে অবস্থান করে। কিন্তু বাইরের শক্তি (আলোক বা বিদ্যুৎ শক্তি) দিয়ে পরমাণুকে উত্তেজিত করা যেতে পারে এবং এতে পরমাণুর শক্তিস্তরের উত্তোলন ঘটে। শক্তিস্তরের উত্তোলনের এই পদ্ধতিকে পাম্পিং (pumping) বলা হয়ে থাকে। পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকে না ; মধ্যবর্তী বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পথে কিছু শক্তির বিকিরণ হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত ও উত্তেজিত বিকিরণ

যখন কোন ফোটন শান্ত অবস্থার পরমাণুকে আঘাত করে তখন ঐ পরমাণু–কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। শক্তি–বৃদ্ধিজনিত কারণে ইলেকট্রন লাফ দিয়ে উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যায়। এই উত্তেজিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে নিচের দুটি ঘটনা ঘটতে পারে ঃ

ক) স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ .

উত্তেজিত পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফোটন (শক্তি) বিকিরণ ক'রে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারে। এতে সময় লাগে এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগেরও কম সময়।

খ) উত্তেজিত বিকিরণ

উত্তেজিত পরমাণু থেকে নির্গত ফোটন যখন অন্য কোন উত্তেজিত পরমাণুকে আঘাত করে তখন দ্বিতীয়টির ফোটন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হতে যে সময় লাগে তারও কম সময়ে বের হয়ে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে উভয় ফোটনই একই দশায় বের হয়ে আসে। এভাবে ফোটন এবং উত্তেজিত পরমাণুগুলির সংঘর্ষে একটি দ্রুত পারস্পরিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, ফলে আরো বেশি সংখ্যক পরমাণু থেকে ফোটন বেরিয়ে আসে। এভাবে একই দশায় বেরিয়ে আসা অসংখ্য ফোটন 'ফোটন তরঙ্গের' সৃষ্টি করে। নতুন সংঘর্ষের দ্বারা সৃষ্ট ফোটন এই বিরাট তরঙ্গের অংশ

হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তেজিত পরমাণু বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফোটন তরঙ্গের বৃদ্ধি হতে থাকে। অধিকাংশ পরমাণু যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখন তরঙ্গের শক্তি আস্তে আস্তে কমে যায়।

উত্তেজিত পরমাণু থেকে ফোটন বের করে আনার এই প্রক্রিয়াকে স্টিমুলেটেড বা উত্তেজিত বিকিরণ বলা হয়ে থাকে—আর এটিই হলো লেজার প্রক্রিয়ার আদিকথা।

আজকাল নানা ধরনের পাম্পিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়—তার মধ্যে 'ফ্লাশ ল্যাম্প' পদ্ধতি একটি। ইলেকট্রনিক ফ্লাশ ল্যাম্প দিয়ে পাম্পিং করার ফলে লেজার পদার্থের পরমাণুগুলি উত্তেজিত হতে থাকে। ফ্লাশ ল্যাম্প হতে আগত সঠিক ফ্রিকোয়েন্সির ফোটনের আঘাতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বহু ফোটন একই দশায় বের হয়ে ফোটন তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

কেলাস বা অন্য যে কোন পদার্থ হতে লেজার রশ্মি পাওয়া সম্ভব। শুধু পদার্থভেদে গোটা যন্ত্রের পার্থক্য হয়ে থাকে ; ফলে আমরা চার ধরনের লেজার দেখতে পাই। যেমন, (ক) কঠিন (কেলাস বা গ্লাস) লেজার, (খ) গ্যাস লেজার, (গ) তরল পদার্থের লেজার, এবং (ঘ) অর্ধপরিবাহী লেজার। এসব লেজারে একই ভাবে শক্তির শোষণ ও বিশোষণ হয়ে থাকে।

লেজার রশ্মি সূর্য-রশ্মি বা বৈদ্যুতিক বাল্‌ব থেকে পাওয়া রশ্মির মতো নয় সূর্য-রশ্মি বা বালব বিচ্ছুরিত রশ্মি দিয়ে ইস্পাতের পাত ছিদ্র করা সম্ভব নয়। লেজার রশ্মি কিন্তু এ কাজটা অতি সহজেই করতে পারে। এই ক্ষমতার কারণ হচ্ছে যে, এ রশ্মি 'কোহেরেন্ট' বা সুসঙ্গত।

কোহেরেন্ট-ধর্মী রশ্মিকে বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে সূর্যের আলো বা বাল্‌বের আলোর মতো সাধারণ আলো নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। এই যে সাধারণ আলো যাকে আমরা সাদা দেখি আসলে তা বর্ণালীর সব ক'টি রং মিলেই হয়েছে। অতএব, যদি ধরা হয় এই আলো সাতটি রঙের সমষ্টি তবে এখানে সাত রকমের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। এর সবগুলি আলোক তরঙ্গ, সম্ভব সবদিকে চলাচল করে—ফলে এসব তরঙ্গের পরস্পর উপরিপাতের দ্বারা ব্যতিচারের (interference) সৃষ্টি করে। কোন পুকুরে অনেকগুলি ঢিল ছোড়ার ফলে সৃষ্ট বহু সংখ্যক তরঙ্গের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। প্রতিটি ঢিলের জন্য ভিন্ন

ভিন্ন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় আর সবগুলি তরঙ্গ মিলে নির্দিষ্ট কোন আকারহীন একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গগুলি একই দশায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে না, সেহেতু প্রাপ্তব্য শক্তি বা আলোর তীব্রতা খুবই কম। এ ধরনের রশ্মিকে 'ইনকোহেরেন্ট' আলোকরশ্মি বলা হয়।

অপরপক্ষে লেজার উৎপাদিত সকল তরঙ্গই সমবিস্তারের এবং এরা বাধাহীন ভাবে একই দশায় সমগতিতে একই দিকে অগ্রসর হয়। এরূপ বিকীর্ণ আলোক রশ্মিকে 'কোহেরেন্ট' বা সুসঙ্গত আলোক রশ্মি বলা হয়। লেজার রশ্মি কোহেরেন্ট ধর্মী ও একই দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ।

অতিমাত্রায় কোহেরেন্ট ধর্মী হওয়ার জন্য লেজার রশ্মিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। সরু অথচ শক্তিশালী লেজার রশ্মিকে প্রায় অপরিবর্তিত ভাবে বহু দূর দূরান্তে পাঠানো সম্ভব। সার্চলাইট, হেডল্যাম্পের ফোকাস করা আলোক রশ্মির কিছু অংশ অনেক সময় দেখা গেছে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই আলোক রশ্মির তীব্র ছটার ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা মোটেই নেই। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এম. আই. টি) এই পরীক্ষা করে দেখানে হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা লেজার রশ্মিকে চাঁদে পাঠান—এই রশ্মি চাঁদের পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফেরত আসে। প্রতিফলিত রশ্মি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পৃথিবী হতে ২,৫০,০০০ মাইল ভ্রমণের পরেও এই রশ্মি চন্দ্রপৃষ্ঠে শুধুমাত্র আড়াই মাইল ব্যাসে বিস্তৃত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে সাধারণ আলোক রশ্মিকে সরু করা সত্ত্বেও সমদূরত্ব যেতে ১০০ গুণ বেশি বিস্তৃত হয়।

কেলাস লেজারই সমধিক প্রচলিত আর রুবি লেজার সকল কেলাস লেজারের মধ্যে জনপ্রিয়। পাম্পিং ক্রিয়ায় উৎপন্ন পরমাণু উত্তেজক রশ্মি এবং বিকীর্ণ লেজার রশ্মি উভয়ের কাছেই কেলাসকে স্বচ্ছ হতে হয়। অন্যকথায় এমন কেলাস ব্যবহার করতে হয় যেটিতে ইনপুট শক্তি ও বিকীর্ণ শক্তি উভয়েই সহজে ঢুকতে ও বের হয়ে আসতে পারে। এছাড়া কেলাস পরমাণুর বিশেষ পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য থাকাও আবশ্যক। রুবি কেলাস এসবের জন্য অতি উত্তম।

হালকা গোলাপী রঙের রুবি কেলাস আসলে খুব অল্প পরিমাণ অপদ্রব্য মিশ্রিত এলুমিনিয়াম অক্সাইড। বিশুদ্ধ এলুমিনিয়াম অক্সাইডের কোন রং নেই এবং

দৃশ্যমান সকল আলোক তরঙ্গই এর মধ্যে দিয়ে কোন শোষণ ছাড়াই বের হয়ে যায়। এলুমিনিয়াম অক্সাইডে শতকরা একভাগ (ওজন হিসাবে) অপদ্রব্য ক্রোমিয়াম

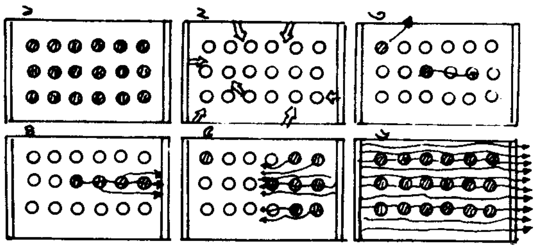

(১) রুবি দণ্ডের ক্রোমিয়াম পরমাণুকে বৃত্তের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

(২) পাম্পিং চলাকালীন অবস্থা। () বৃত্ত দ্বারা উত্তেজিত পরমাণু বুঝানো হয়েছে।

(৩) দু'টি পরমাণু রশ্মি বিকিরণ ক'রে অনুত্তেজিত অবস্থায় পৌঁছেছে। দণ্ডের সমান্তরাল পথে ধাবমান রশ্মিটির সাথে অন্যান্য উত্তেজিত পরমাণুর সংঘর্ষের সম্ভাবনা।

(৪) সংঘর্ষের দ্বারা আলোক রশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধি।

(৫,৬) আয়নার অস্বচ্ছ পিঠে প্রতিফলিত হয়ে আলো তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। অবশেষে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে রুবি দণ্ডের অপেক্ষাকৃত কম অস্বচ্ছ পিঠ হতে বের হয়ে আসে।

[চিত্র ৫·৪]

অক্সাইড মিশ্রিত করা হয়। রুবি কেলাসে এই ক্রোমিয়াম পরমাণু ৫৬০০×১০^{-৮} সে.মি. (হলুদ-সবুজ) ও ৪১০০×১০^{-৮} সে.মি. (বেগুনী) দৈর্ঘের আলোক রশ্মি শোষণ করতে পারে আর লাল, নীল আলোক রশ্মি বিনা বাধায় পার হয়ে যায়। লাল ও নীলের সম্মিলিত রঙই রুবি কেলাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোলাপী রঙের সৃষ্টি করে। হলুদ-সবুজ আলোক রশ্মির শক্তি শোষণের ফলে ক্রোমিয়াম পরমাণু উত্তেজিত হয়ে যায়। প্রথমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতি অল্প ধাপের শক্তিমাত্রার পতন হয় এবং পরে পরমাণুটি একটি বিশেষ শক্তি স্তরে কয়েক মিলি-সেকেণ্ডের জন্য

অবস্থান করে। এই শক্তিস্তরকে 'মেটাস্টেবল' স্তর বলে। এই স্তর হতেই পরমাণুগুলি ফোটন বিকিরণ করতে আরম্ভ করে এবং এর ফলে 'মেটাস্টেবল' স্তরে অবস্থানকারী সকল পরমাণুর সাথে সঠিকভাবে সংঘর্ষ ঘটে। ফলে এ ধরনের আরো বহু ফোটনের 'স্টিমিউলেটেড' বিকিরণ হয় এবং তা' রুবি দন্ডের বাইরে আসে। এ রশ্মির রং গভীর লাল—তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৬৯৪৩×১০^{-৮} সে.মি.। শক্তির শোষন পদ্ধতির জন্য বিকীর্ণ রশ্মি ফ্লাশলাইটের মতো অবিচ্ছিন্ন হয় না। বরং এটি সংক্ষিপ্ত আলোর ঝলক হিসেবে বের হয়ে আসে।

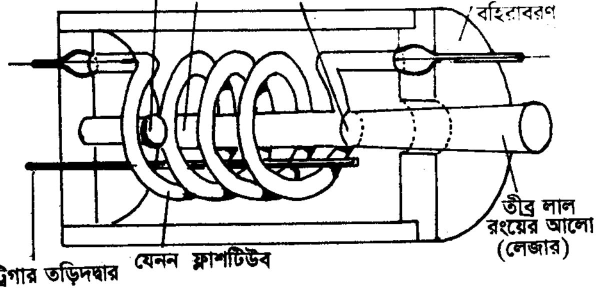

[চিত্র ৫·৫ রুবি লেজার]

ট্যান্টালামের গলনাঙ্ক দশ হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট। অথচ একটি সাধারণ রুবি লেজার রশ্মির সাহায্যে এ রকম একটি কঠিন ধাতুর পাতকে এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগেরও কম সময়ে ছিদ্র করে ফেলতে কোন বেগ পেতে হয় না।

রাডারে লেজার রশ্মি ব্যবহার ক'রে মহাশূন্যের লক্ষ বস্তুর এমন স্পষ্ট ও সুন্দর ছবি পাওয়া সম্ভব যা আগে কখনও কল্পনা করা যেত না। সুঁচের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ম লেজার রশ্মির সাহায্যে টেলিভিশন ও টেলিযোগাযোগ করা সম্ভব, এবং এ ধরনের যোগাযোগ ইচ্ছাকৃত 'জ্যামিং' হতেও সুরক্ষিত।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সূর্যরশ্মিকে কাগজের কোন বিন্দুতে ঘনীভূত করলে সহজেই কাগজ পুড়ে যায়—একথা আমরা সবাই জানি। লেজার রশ্মিকে লক্ষ লক্ষ

কোটি আলোক কণিকার সমতুল্য মনে করা যেতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে যে শক্তিশালী লেজার রশ্মি মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্যবস্তুর কোন বিন্দুতে ১২০০০ °C তাপমাত্রা উৎপন্ন করতে পারে। এই তাপ কোন বস্তুর ক্ষুদ্রাংশকে মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প করে দিতে সক্ষম। পৃথিবী বা মহাশূন্যযান হতে লক্ষ বস্তুর দূরত্ব অতি সহজে লেজারের সাহায্যে নির্ভুলভাবে বের করা সম্ভব। ৫×১০^৫ কিলোওয়াট শক্তির রুবি লেজারের সাহায্যে ৩০০ মাইল দূরত্ব মাপতে দুই ফুটের চাইতেও কম ভুল হয়।

ছয়

অর্ধপরিবাহীর বিচিত্র কথা

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ধাতব পরিবাহীর রোধতা সাধারণতঃ $১০^{-৬}$ থেকে $১০^{-৪}$ ওহ্‌ম-সে.মি. এবং অপরিবাহীর জন্য এই মান $১০^{১১}$ থেকে $১০^{১২}$ (সর্বোচ্চ $১০^{১৮}$) ওহম-সেমি.। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী (রোধতা $১০^{-৩}$ — $১০^{৬}$ ওহম-সে.মি.) অঞ্চলের পদার্থ যেমন, জার্মেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি একেবারে অপরিবাহী নয়, আবার সুপরিবাহীও নয়। এ জন্য এদেরকে অর্ধপরিবাহী বলা হয় তা' আগেই বলা হয়েছে।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্লিমেন্স উইঙ্কার সর্বপ্রথম জার্মেনিয়াম মৌল পদার্থ পৃথক করেন। সিলিকনের মতোই এর ধর্ম। জার্মেনিয়াম অর্ধপরিবাহী তা আকস্মিকভাবেই আবিষ্কৃত হয়, তার আগে প্রকৃতপক্ষে এর কোন গুরুত্বই ছিল না।

জার্মেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতির পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষে চারটি ইলেকট্রন থাকে —এজন্য এদেরকে চতুর্যোজী বলা হয়। নিকটবর্তী চারটি পরমাণুর সাথে সহযোজী বন্ধনে এদের কেলাস গঠিত হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় জার্মেনিয়াম তেমন পরিবাহী না হলেও উচ্চতর তাপমাত্রায় বেশ পরিবাহী হয়ে উঠে। অর্ধপরিবাহী কেলাসের মধ্যে সামান্য কয়েক কণা অপদ্রব্য (impurities) প্রবেশ করালে চার্জবাহীর সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন এদের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা অনেক গুণে বেড়ে যায়।

প্রতি একশ' কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে মাত্র একটি গ্যালিয়াম বা আর্সেনিক পরমাণু প্রবেশ করানো হলে জার্মেনিয়ামের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা প্রায় এক হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। আরো কিছু পরিমাণ অপদ্রব্য যোগ করলে এর পরিবাহিতা এক লক্ষ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশুদ্ধ নিকেল অক্সাইড কুপরিবাহী—অথচ এতে মাত্র ১ ভাগ লিথিয়াম মেশালে এর রোধ-ক্ষমতা প্রায় ১০০০০০০০০০০০০০ গুণ হ্রাস পায়।

RANSDOC Library
Accession No. 18449

অর্ধপরিবাহীকে মোট দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (১) বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী, ও (২) দূষিত অর্ধপরিবাহী।

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে কোন প্রকার অপদ্রব্য থাকে না। জার্মেনিয়াম, সিলিকন, টিন প্রভৃতি এ জাতীয় পরিবাহীর মধ্যে পড়ে। এ সমস্ত কেলাসের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা খুবই কম থাকে।

দূষিত অর্ধপরিবাহী

বিশুদ্ধ পরিবাহীতে উপযুক্ত কোন অপদ্রব্যের উপস্থিতি এর মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন বা 'পজিটিভ হোল' এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ফলে এদের পরিবাহিতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। অপদ্রব্য কণামিশ্রিত এ ধরনের অর্ধপরিবাহীকে দূষিত অর্ধপরিবাহী বলে।

অপদ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে দূষিত অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রন দাতা অথবা ইলেকট্রন গ্রহীতা হিসেবে কজ করে। মিশ্রণের জন্য সাধারণত দু'ধরনের অপদ্রব্য ব্যবহার করা হয় ঃ

১. পঞ্চযোজী অপদ্রব্য ঃ যেমন আর্সেনিক, বিসমাথ, ফসফরাস, এন্টিমনি ইত্যাদি।

২. ত্রিযোজী অপদ্রব্য ঃ যেমন বোরন, এলুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম, ইণ্ডিয়াম ইত্যাদি।

অপদ্রব্যের মিশ্রণের ফলে কোন কেলাসের মধ্যে যদি মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে তা দাতা হিসেবে কাজ করে। আর যদি মুক্ত ইলেকট্রনের সংখা কমে যায় তবে তার মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং কেলাসটি গ্রহীতা হিসেবে কাজ করে। গ্রহীতার মধ্যে উৎপন্ন ইলেকট্রন-ঘাটতির অণুসমষ্টিকে 'পজিটিভ হোল' বলা হয়ে থাকে। গ্রহীতাকে p-শ্রেণীর এবং দাতাকে n-শ্রেণীর অর্ধপরিবাহী বলা হয়।

মুক্ত ইলেকট্রনের চলাচলের জন্যই বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। 'পজিটিভ হোল'-এর বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ভিন্ন পদ্ধতিতে হয়। পাশের পরমাণুর একটি

Library

ইলেকট্রন 'পজিটিভ হোল' এর সাথে মিলিত হয়ে তাকে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ করে দেয়। পাশের পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন ঘাটতি হয় বলে তা একটি 'হোল' এ পরিণত হয়। এই হোল আবার পাশের কোনও পরমাণুর ইলেকট্রন আকর্ষণ করে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ হয়। এভাবে হোল–এর স্থানান্তরের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

৬·১ নং চিত্রে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী জার্মেনিয়াম কেলাসে পঞ্চযোজী অপদ্রব্য আর্সেনিক মিশ্রণের ফলাফল দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরমাণু আর্সেনিক জার্মেনিয়ামের অবস্থান অধিকার করেছে। অপদ্রব্য আর্সেনিক পরমাণুর পাঁচটি যোজনী ইলেকট্রনের মধ্যে চারটি নিকটস্থ জার্মেনিয়াম পরমাণুর সাথে সহযোজী বন্ধনে পূর্ণ হবার পর একটি ইলেকট্রন উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত ইলেকট্রনই মুক্ত ইলেকট্রনের ন্যায় কাজ ক'রে জার্মেনিয়ামের পরিবাহিতা বৃদ্ধি করে। এভাবে জার্মেনিয়াম n- শ্রেণীর কেলাসে পরিণত হয়। ধরা যাক, প্রতি দশ লক্ষ জার্মেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে একটি মাত্র আর্সেনিক পরমাণুর অপদ্রব্য আছে। হিসেব করলে দেখা যাবে যে এজন্য এক সে.মি. n-শ্রেণীর জার্মেনিয়ামে $১০^{১৭}$ টি আর্সেনিক পরমাণু আছে। ফলে প্রতি ঘন সেঃ মিঃ–এ $১০^{১৭}$ বা ১০০০০০০০০০০০০০০০০০টি মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, তামার মত সুপরিবাহী ধাতুতে প্রতি ঘন সেঃমিঃ –এ $১০^{২৩}$ টি বা দশ লক্ষ গুণ বেশি মুক্ত ইলেকট্রন থাকে।

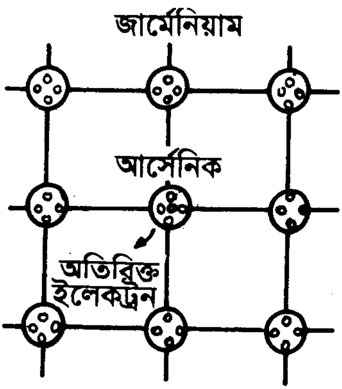

চিত্র ৬·১ n-শ্রেণীর জার্মেনিয়াম]

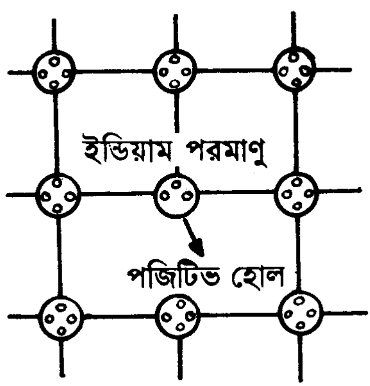

[চিত্র ৬·২ p-শ্রেণীর জার্মেনিয়াম]

অপর পক্ষে ইণ্ডিয়াম বা বেরিয়ামের মত ত্রিযোজী অপদ্রব্য মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট কেলাসের গঠন ৬.২ নং চিত্রের ন্যায় হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণু ইণ্ডিয়াম জার্মেনিয়াম অণুর স্থান অধিকার করেছে। ইণ্ডিয়ামের তিনটি যোজনী ইলেকট্রন থাকায় নিকটস্থ জার্মেনিয়ামের সাথে সহযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হতে এর একটি ইলেকট্রন ঘাটতি পড়ে। ফলে কেলাস ল্যাটিসে একটি পজিটিভ-হোল এর সৃষ্টি হয়। এভাবে সমন্বয়টি একটি পজিটিভ হোল হিসেবে ইলেকট্রন-গ্রাহক কেলাসে পরিণত হয়।

কেলাস ডায়োড

একটি ডায়োড বা দ্বিতড়িদ্দ্বার মূলত ইলেকট্রন সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বইয়ের পরিশিষ্টে ডায়োড ভাল্‌ভ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু কেলাস ডায়োড সম্পর্কে বলা হবে। জার্মেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি অর্ধপরিবাহী কেলাসের ধর্ম বা গুণাগুণ ব্যবহার করে ডায়োড তৈরি করা হয়।

কেলাস ডায়োড দু'রকমের ঃ বিন্দু-স্পর্শ ডায়োড আর জাংশন বা সংযোগ-ডায়োড। একটি পাতলা ধাতব তারের ছুঁচালো প্রান্তের সাথে জার্মেনিয়াম, সিলিকন বা অন্য কোন কেলাসের সংযোগ দ্বারা একটি বিন্দু-স্পর্শ ডায়োড তৈরি হয়। কেলাসের তুলনায় ধাতব তার A-কে পজিটিভ বিভবে রাখলে বিদ্যুৎ প্রবাহ খুবই সামান্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। অথচ এর উল্টোটি করলে (অর্থাৎ C-কে A-র তুলনায় পজিটিভ) রোধতা বৃদ্ধির কারণে খুবই সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়।

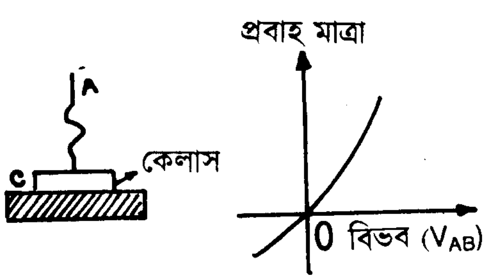

[চিত্র ৬.৩]

ধাতব অর্ধপরিবাহীর বিন্দু-স্পর্শ ডায়োডের আচরণ পুরাপুরিভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবুও এটা ধরে নেয়া হয় যে ধাতব তারের ছুচালো কেলাসকে স্পর্শ বিন্দুতে p বা n-শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে।

একমুখীকারক হিসেবে বিশেষভাবে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পানাঙ্কে (ধারকত্বের মান খুবই কম ০.১ পিকো-ফ্যারাড হওয়াতে) এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সংযোগ-ডায়োড সম্পর্কে আলোচনার আগেই এ ধরনের ডায়োডের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

ক্যাট-হুয়িস্কার কেলাস গ্রাহক যন্ত্র

কেলাস গ্রাহক যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত থাকা অবস্থায় ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাট-হুয়িস্কার (cat whisker) গ্রাহক যন্ত্র আবিষ্কার হয়। এর আবিষ্কারক হলেন বেন্ মিসনার নামক আমেরিকান নৌবাহিনীর একজন রেডিও অপারেটর। উল্লেখ্য যে, ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ক্যাট-হুয়িস্কার নাম প্রচলিত হয় এবং তা আজো প্রচলিত আছে। তবে কেউ জানে না যে কে সর্বপ্রথম এর নাম ক্যাট-হুয়িস্কার রেখেছিলেন।

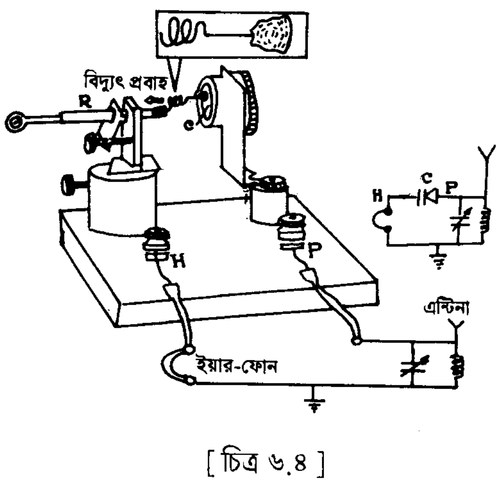

[চিত্র ৬.৪]

স্থুল (crude) স্প্রিংয়ের আকারে তামার তারের একপ্রান্ত একটি দণ্ড R-এর সাথে যুক্ত থাকে। এ দণ্ডকে সহজেই সামনে বা পিছনের দিকে নড়ানো যায়।

স্প্রিংয়ের মতো এই তারের অপর প্রান্তটি ছুঁচালো। এখন দণ্ডটিকে সামনের দিকে সরালে তামার তারের ছুঁচালো প্রান্তের সাথে যুক্ত কেলাস C-এর সংযোগ ঘটে।

একটি বেতার এরিয়েল, একটি তারের কুণ্ডলী (L) ও একটি টিউনিংধারক C-কে কেলাসের P-প্রান্তে যোগ করা হয়। ধারকের ডায়াল ঘুরিয়ে বর্তনীকে বেতার তরঙ্গের অনুকম্পে বাঁধা (tuned) হয়। ক্যাট-হুয়িস্কারের সাথে এক জোড়া ইয়ার-ফোনও লাগানো হয়। ক্যাট হুয়িস্কার ও কেলাস উভয়ে মিলে এদের সংযোগ স্থলে সঙ্কেত একমুখী কারক' হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের গ্রাহকযন্ত্র অধিকতর সুগ্রাহী ও নির্ভরযোগ্য। অধিকন্তু দামে খুবই সস্তা হওয়ায় অচিরেই এটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। বেতার প্রেরণের প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ শ্রোতাই এ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। ক্যাট-হুয়িস্কার লাগিয়ে সব ধরনের কেলাসকে কিন্তু প্রবাহের একমুখী কারক হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। গ্যালিনা দ্বারা এটি সম্ভব, তাও আবার এর পৃষ্ঠের সব বিন্দুতে নয়। আর এজন্যই ক্যাট-হুয়িস্কারের ছুঁচালো প্রান্ত উপযুক্ত বিন্দু খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। এ ধরনের যন্ত্রে সিলিকন ও কার্বোরেণ্ডামও ব্যবহার করা হতো।

মনে রাখা দরকার, একটি এন্টিনা, টিউনার, ডিটেক্টর ও ইয়ার-ফোন একটি সাধারণ গ্রাহক যন্ত্রের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত গ্রাহক যন্ত্রে এছাড়াও আরো বহু যন্ত্রাংশ রয়েছে—এগুলি শুধু শব্দের গুণাগুণ ও লাউড স্পীকার চালনার মত শক্তিশালী সংঙ্কেত উৎপন্ন করতে সাহায্য করে থাকে।

আজকাল অধিকতর নির্ভরযোগ্য কেলাস গ্রাহক যন্ত্র পাওয়া যায়। এসব যন্ত্রে অর্ধপরিবাহী জার্মেনিয়াম কেলাস ব্যবহৃত হয়। বিন্দু-স্পর্শ জার্মেনিয়াম ডিটেক্টর বা জার্মেনিয়াম ডায়োড প্রায়ই আদি ক্যাট-হুয়িস্কার এবং কেলাসের মতোই কাজ করে তবে এক্ষেত্রে ক্যাট-হুয়িস্কারের ছুঁচালো অগ্রভাগকে কেলাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। আর এতে অনেক সুবিধা। কেননা বেতার-সঙ্কেত পেতে হলে আদি ক্যাট-হুয়িস্কার যন্ত্রের মতো এখানে কোন কিছু 'এডজাস্টমেন্ট' বা ঠিকঠাক করতে হয় না।

ধীরে ধীরে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কেলাস গ্রাহক যন্ত্রের জনপ্রিয়তা কমে যায়। তখন শুরু হলো ডায়োড ভাল্‌ভ গ্রাহক-যন্ত্রের যুগ। এ যন্ত্রে ব্যবহৃত ডায়োড একটি তাপায়নিক ভাল্‌ভ — আর এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রবাহকে একমুখী করতে পারে। এরপর আসে বহু তড়িদ্দ্বার বিশিষ্ট ভাল্‌ভ —যেমন ট্রায়োড, টেট্রোড,

পেন্টোড বেতার যন্ত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু এর সাথে সাথে বেতার যন্ত্রের আয়তন ও ওজন উভয়ই বেড়ে যেতে থাকে।

কেলাসের চিত্তাকর্ষক গুণাবলী লোকে কিন্তু মোটেই ভুলে যায়নি। এর মধ্যে রাডার আবিষ্কৃত হলো আর তার উন্নতি সাধনও হতে লাগলো। উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে তাপায়নিক ডায়োড নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি করলো। একে তো ডায়োড ব্যবহারে যন্ত্রের আয়তন ও ওজন বেড়ে যায়, তদুপরি ডায়োডের ধারকত্বের মানও অসুধিাজনক ভাবে খুবই বেশি। অথচ উচ্চ কম্পনাঙ্ক বিন্দু স্পর্শ কেলাস–ডায়োড ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই, কেননা এখানে ধারকত্বের মান খুবই কম। তাছাড়া রাডারের যন্ত্রাংশ হিসেবে এর ওজনও নিতান্ত কম। কাজেই রাডারের উপযুক্ত যন্ত্রাংশ হিসেবে বিন্দু–স্পর্শ ডায়োডের চাহিদা বেড়ে যায় আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে এর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়। বর্তমান যুগের কেলাস ডায়েড সম্পূর্ণরূপে ভিন্নভাবে তৈরি হয়ে থাকে—এদেরকে সংযোগ ডায়োড বলা হয়। এরা একমুখীকারক ও ডিটেক্টর হিসেবে বিন্দু স্পর্শ ডায়োডের চেয়েও ভাল কাজ করে। এখন আমরা সংযোগ ডায়োড সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সংযোগ ডায়োড ঃ (p-n সংযোগ)

একটি p-শ্রেণীর ও একটি n-শ্রেণীর জার্মেনিয়াম কেলাসের পরস্পরের সংযোগের (চিত্র ৬.৫ক) ফলে যে সমন্বয়টি উৎপন্ন হয় তাকে p-n সংযোগ ডায়োড বলে। p-n সংযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে p-অঞ্চল হতে কিছু 'হোল' n-অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সমসংখ্যক ইলেকট্রনের সাথে মিলে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ হয়। আবার n-অঞ্চল হতে কিছু ইলেকট্রন p-অঞ্চলের হোল' এর সাথে মিলে অনুরূপ আবস্থার সৃষ্টি করে। সমগ্রভাবে কেলাস বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ ; তাই সংযোগের মধ্য দিয়ে উভয় প্রকারের চার্জের স্থানান্তরের ফলে একটি বিভব–প্রাচীরের (potential barrier) সৃষ্টি হয়। এই বিভব–প্রাচীর সংযোগের মধ্য দিয়ে আর চার্জ স্থানান্তরিত হতে পারে না।

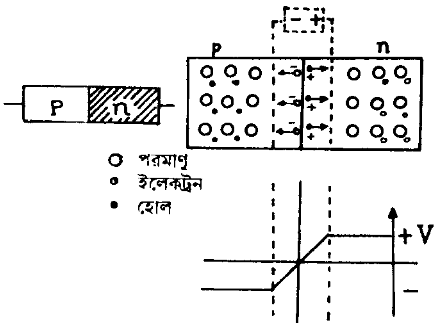

[চিত্র ৬.৫ ক]

একটি সাধারণ ডায়োড কিভাবে তৈরি হয় তা ৬·৫ খ চিত্রে সংক্ষেপে দেখানো হলো

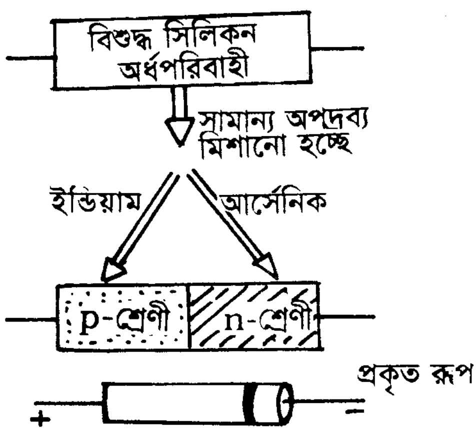

[চিত্র ৬·৫ খ একটি ডায়োডের গঠন]

সংযোগ ডায়োডের ব্যবহার

একমুখী হিসেবে p-n সংযোগ ডায়োড ঃ p-n সংযোগে ব্যাটারির সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে চাইলে দু'রকমে তা করা যায়। সংযোগের n–প্রান্তে কোন ব্যাটারির পজিটিভ ও p–প্রান্তে নেগেটিভ টার্মিনাল সংযুক্ত করলে বিভব প্রাচীরের উচ্চতা বেড়ে যাবে। এতে সংযোগের রোধতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যুৎ প্রবাহ অতি ক্ষীণ (এক অ্যাম্পিয়ারের দশ লক্ষ ভাগের কয়েক ভাগ মাত্র) হবে। এ ধরনের ব্যাটারি সংযোগকে 'রিভার্স' বা পশ্চাদবর্তী বায়াস বলে (চিত্র ৬·৬ ক)।

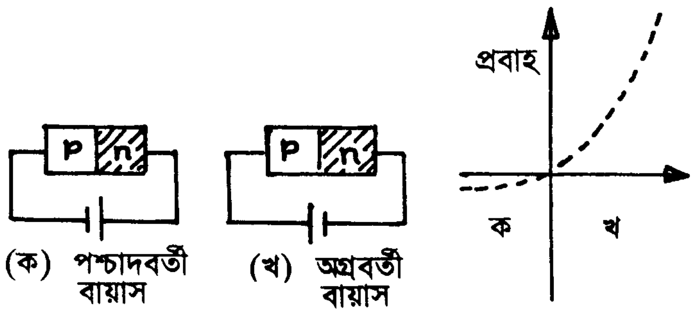

[চিত্র ৬·৬ ক, খ]

আবার যদি p–প্রান্তের সঙ্গে ব্যাটরীর প্রজিটিভ এবং n–প্রান্তের সঙ্গে নেগেটিভ টার্মিনাল সংযুক্ত হয় তবে বিভব প্রাচীরের উচ্চতা কমে যাবে এবং সংযোগের ক্রিয়াশীল–রোধও কমে যাবে। এ অবস্থায় (চিত্র ৬.৬খ) ব্যাটারি 'ফরওয়ার্ড' বা অগ্রবর্তী বায়াসে যুক্ত হয়েছে বলা হয়। অগ্রবর্তী বায়াসে প্রযুক্ত বিভবের মান খুব অল্প (ধরা যাক, ০.৫ ভোল্ট) হলেও এ ক্ষেত্রে কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

চিত্রে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্‌বর্তী বায়াসে একটি p-n সংযোগের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখানো হয়েছে। বিদ্যুৎ–প্রবাহের এই অসমতার দরুন p-n সংযোগকে 'রেক্‌টিফায়ার' বা একমুখীকারক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

একমুখী কারক হিসেবে ডায়োড ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের মতো কাজ করে বলে p-n সংযোগকে 'অর্ধপরিবাহী ডায়োড' বলা হয়।

সিলিকন ডায়োড বিদ্যুৎ-চালিত রেল ও অন্যান্য ইঞ্জিনের শক্তি-বর্তনীতে ব্যবহৃত হয়।

অর্ধপরিবাহী ডায়োডের সুবিধা

ভ্যাকুয়াম ডায়োড বা ভাল্‌ভের তুলনায় অর্ধপরিবাহী ডায়োডের ব্যবহারে অনেক সুবিধা। নীচে প্রদত্ত অর্ধপরিবাহী ডায়োডের প্রধান প্রধান সুবিধার দিকে লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে ঃ

ক. ভাল্‌ভের মতো এখানে ভ্যাকুয়ামের প্রয়োজন নেই।
খ. ক্যাথোড উত্তপ্ত করার জন্য ফিলামেন্টের দরকার নেই।
গ. আয়তনে ক্ষুদ্র ও কম খরচে তৈরি করা যায়।
ঘ. বিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক অপচয় হয় না।
ঙ. ধারকত্বের মান কম।
চ. বিশেষভাবে তৈরি p-n সংযোগ ডায়োডকে অতি উচ্চ ফ্রিকোয়িন্সিতে একমুখীকারক হিসেবে ববহার করা যায়।
ছ. ভালভের চেয়ে অনকে গুণে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যায়।
জ. ধাক্কা লেগে বা পড়ে গিয়ে সহজেই অকেজো হবার সম্ভাবনা নেই।
ঝ. দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

অবশ্য অর্ধপরিবাহী ডায়োড ব্যবহারে কিছু কিছু অসুবিধাও যে নেই এমন বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে পশ্চাদবর্তী বায়াসেও কিছু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় কিন্তু ভাল্‌ভের বেলায় তা' হয় না।

সৌর বিদ্যুৎ-কোষ

p-n সংযোগের দু'প্রান্তকে দু'টি ধাতব প্লেটের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে এদের মধ্যে একটি প্রবাহ-মাপক যন্ত্র মিলি-অ্যামিটার সংযুক্ত করলে সমন্বয়টি (চিত্র ৬.৭) একটি সৌর বিদ্যুৎ-কোষ হিসেবে কাজ করে।

গোটা সমন্বয়টিকে কোন অন্ধকার কক্ষে একই তাপমাত্রায় রেখে দিলে যন্ত্রে কোন প্রবাহই নির্দেশিত হবে না। এক্ষেত্রে কেলাস ও ধাতব প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে পশ্চাদমুখী স্পর্শ বিভবের (reverse contact potential) দরুন E ও C এর মধ্যে কোন বিভব পার্থক্য হয় না ; ফলে বিদ্যুৎও প্রবাহিত হয় না। কিন্তু চিত্রের ন্যায় p-n সংযোগে আলোক আপতিত হ'লে এই আলোকশক্তি অতিরিক্ত ইলেকট্রন মুক্ত করবে এবং তাতে হোল–এরও সৃষ্টি হবে। সংযোগ অঞ্চলের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই ইলেকট্রন p-থেকে n–এর দিকে এবং হোল n-থেকে p-এর দিকে চলাচল করে। তারফলে সৃষ্ট প্রবাহ যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রান্তবর্তী ধাতব প্লেট E ও C একটি বৈদ্যুতিক কোষের টার্মিনাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

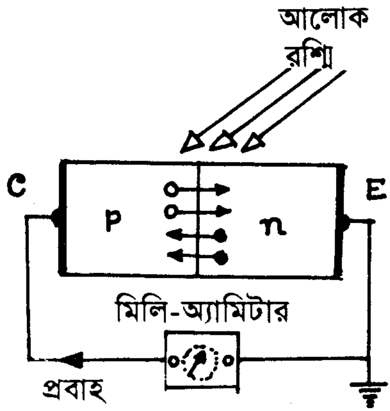

[চিত্র ৬.৭]

সৌর–কোষ সূর্যালোক থেকেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এগুলি খুবই সাদাসিধে বৈদ্যুতিক কোষ। এ ধরনের কোষের ওজন ও আয়তন খুবই কম হয়ে থাকে। তাই এদের বহুবিধ ব্যবহারও বিদ্যমান। কৃত্রিম উপগ্রহে শক্তি সরবরাহের জন্য এগুলির ব্যবহার অতি সুপরিচিত ; কেননা উপগহের ওজন যথাসম্ভব কম রাখেত হয় এবং কক্ষে প্রেরণের জন্য উপগ্রহের সামান্য ওজনের পার্থক্যই জ্বালানী ও রকেটের আয়তন বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহের জন্য দীর্ঘদিন ব্যবহারোপযোগী ছোট নিউক্লিয়ার চুল্লী ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে।

সৌর–কোষ সূর্যের আলোকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং উপগ্রহের বিভিন্ন সাজ–সরঞ্জামে শক্তি সরবরাহ করে। এ ধরনের কোষগুলি উপগ্রহে রক্ষিত অন্যান্য ব্যাটারিকেও চার্জ করে যাতে করে উপগ্রহ যখন পৃথিবীর ছায়ায় অবস্থিত (অর্থাৎ সূর্য রশ্মি থেকে বঞ্চিত) তখন এই ব্যাটারিই বিভিন্ন যন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে থাকে।

এক্স-রশ্মি, অতিবেগুণী বা অন্যান্য রশ্মি থেকে সৌর-কোষকে রক্ষা করার জন্য স্বচ্ছ কোয়ার্জের এক পাতলা আবরণ ব্যবহার করা হয়। ফলে সূর্যের আলো সহজেই এর ভিতর প্রবেশ করতে পারে কিন্তু অন্যান্য রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সৌরকোষকে সাফল্যজনকভাবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় ভ্যানগার্ড নামক উপগ্রহে – ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এতে ছ'টি সৌর ব্যাটারি (প্রতিটির আয়তন ২ বর্গ ইঞ্চি) উপগ্রহের এলুমিনিয়াম বডিতে লাগানো হয়েছিল। এগুলি বেতার সঙ্কেত প্রেরণের জন্য ৫ মিলিওয়াট শক্তি সরবরাহ করেছিল। উপগ্রহে অবশ্য দ্বিতীয় একটি ট্রান্সমিটারও রাখা হয়েছিল এবং এটি সাধারণ পারদ কোষ-এর সাহায্যে দশ মিলিওয়াট শক্তি সরবরাহে সক্ষম ছিল।

এ পর্যন্ত অসংখ্য উপগ্রহ মনুষ্যবাহী-যান পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য কক্ষপথে এবং মহাকাশে সন্ধানী-যান প্রেরিত হয়েছে। মহাশূন্য সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণই এ সবের মুখ্য উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রায় ৪০ টি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে এবং বহু সংখ্যক মহাকাশ সন্ধানী-যান চন্দ্র ও সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল এবং মহাশূন্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ ক'রে দূর-দুরান্তের সাথে তথা বিশ্বজোড়া টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও টেলিভিশনের মাধ্যমে যোগাযোগ সাধনের জন্য এ সমস্ত উপগ্রহের অবদান যথেষ্ট। সৌরকোষ সজ্জিত এ রকম কয়েকটি উপগ্রহ সম্পর্কে তথ্যাদি এখানে দেওয়া হলো ঃ

কৃত্রিম উপগ্রহ	উৎক্ষেপণ তারিখ	উদ্দেশ্য ও কাজ	সৌর-কোষের সংখ্যা
পাইওনিয়র -V	১২ ই মার্চ, ১৯৬০ (কেপ ক্যার্নিভাল, ফ্লোরিডা থেকে)	মহাশূন্য গবেষণা ও দূর-দূরান্তের যোগাযোগ পরীক্ষা। দু'টি প্রেরকযন্ত্র পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। পৃথিবী থেকে ২·২ কোটি মাইল দূরত্ব পর্যন্ত ১০৬ দিন ধরে যোগাযোগ রক্ষিত হয়।	৪৮০০ সৌর কোষ ২৮টি নিকেল-ক্যাডমিয়ম ব্যাটারি চার্জের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রেরণ শক্তি ঃ ১৫০ ওয়াট।

কৃত্রিম উপগ্রহ	উৎক্ষেপণ তারিখ	উদ্দেশ্য ও কাজ	সৌর-কোষের সংখ্যা
টাইরস -I	পহেলা এপ্রিল ১৯৬০	বিশ্বজোড়া আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ঃ এর কার্যকাল ৭৮ দিন। ৭৮ দিন ধরে ২২000টি মেঘের ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে (আসলে এটি প্রায় ৫০ বছর ধরে কক্ষে থাকবে)।	৯২০০ সিলিকন সৌর-কোষ বেতার সংকেত প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। (নিকেল-ক্যাডমিয়ম ব্যাটারিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত হয়)।
নিম্বাস	১৯৬০ এর শেষার্ধে	আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত আবহাওয়া উপগ্রহ। প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা ধরেই ছবি প্রেরণের জন্য এটি উৎক্ষিপ্ত হয়।	বহু সৌরকোষ সজ্জিত
এক্সপ্লোরার-XII	১৫ই আগষ্ট ১৯৬১	সৌর বাতাস, মহাশূন্যের চৌম্বক ক্ষেত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হয়।	৫৬০০ সৌর-কোষ (এবং ১৩টি সিলভার ক্যাডমিয়ম ব্যাটারি)
রেনজার -I	২৩শে আগষ্ট ১৯৬১	মহাশূন্যে গবেষণা এবং চন্দ্রগামী যানের জন্য সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা পরিচালনা।	৮৬৮০ সৌর-কোষ, ১৫০-২১০ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি।
টেলস্টার	১০ই জুলাই ১৯৬২	বিশ্বজোড়া টেলিভিশন যোগাযোগের পূর্বসূরী উপগ্রহটি পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নানা সংবাদ ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে। এটির ইলেকট্রনিক বর্তনী ক্ষীণ প্রেরিত সঙ্কেতকে এক হাজার গুণ পরিবর্ধিত করে তা পুনরায় প্রেরণ করে।	৩৬০০ সৌর-কোষ।

এছাড়াও ৯৩-জাতি INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization) যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে INTELSAT এর উপগ্রহ ১৯৬০ সালে মাত্র ১০০টি টেলিফোন বর্তনী নিয়ে শুরু হয়। আর তা ১৯৭৫ সালে ১০,০০০ বর্তনীতে বৃদ্ধি পায়। বর্তমান বৃদ্ধির হার শতকরা ১৮। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ এর মধ্যে সাতটি INTELSAT IV উপগ্রহ সাফল্যের সাথে উৎক্ষেপণ করা হয়। এদের প্রত্যেকটিই টেলিভিশনসহ চার হাজার দ্বিমুখী টেলিফোন সংবাদ আদান-প্রদানে সক্ষম। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর এবং ১৯৭৬ এর জানুয়ারিতে উৎক্ষিপ্ত INTELAST IV-A উপগ্রহ দু'টিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী —এদের প্রত্যেকটিই টেলিভিশনসহ ৬০০ দ্বিমুখী টেলিফোন সংবাদ আদান প্রদানে সক্ষম। এ রকম আরো চারটি উপগ্রহ পরবর্তীতে তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নততর সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা কার্যে ব্যবহৃত একটি 'অরবিটাল টেস্ট স্যাটেলাইট' ১৯৭৭ এর মাঝামাঝি উৎক্ষিপ্ত হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সৌর কোষ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ঘরে বসে আজ যখন বিদেশে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলা বা অন্য কোন অনুষ্ঠান উপভোগ করি তা হয়তো পাঁচ হাজার কি দশ হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর কোথাও তখনই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা একে বলি live অনুষ্ঠান। সংবাদে হয়তো দেখানো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় বসে কোন রিপোর্টার আমেরিকার হোয়াইট হাউজে অবস্থানরত প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করছেন ও তা তাৎক্ষণিকভাবে সারা পৃথিবীতে প্রচার করা হচ্ছে। এ ধরনের জিনিষ ২৫/৩০ বছর আগে আমরা কল্পনাই করতে পারতাম না। আর আজ তা সম্ভব হচ্ছে এইসব কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহের মাধ্যমে। ১৯৬২ সালে আমেরিকা প্রথম বিশ্বজোড়া টেলিভিশন যোগাযোগের জন্য 'TELSTAR" নামক যোগাযোগ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন 'MOLNIYA' নামক প্রায় একই ধরনের যোগাযোগ উপগ্রহ মহাকাশে পাঠায়। একটি মাত্র উপগ্রহের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র সব সময় খবর পাঠানো সম্ভব না হওয়ায় ১৯৬৭ সালে আমেরিকা উন্নত ধরনের INTELSAT নামক কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার শুরু করে। বর্তমানে তিনটি INTELSAT দ্বারা সারা পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। আটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর পৃথিবীর এই তিনটি মহাসাগরের উপরে

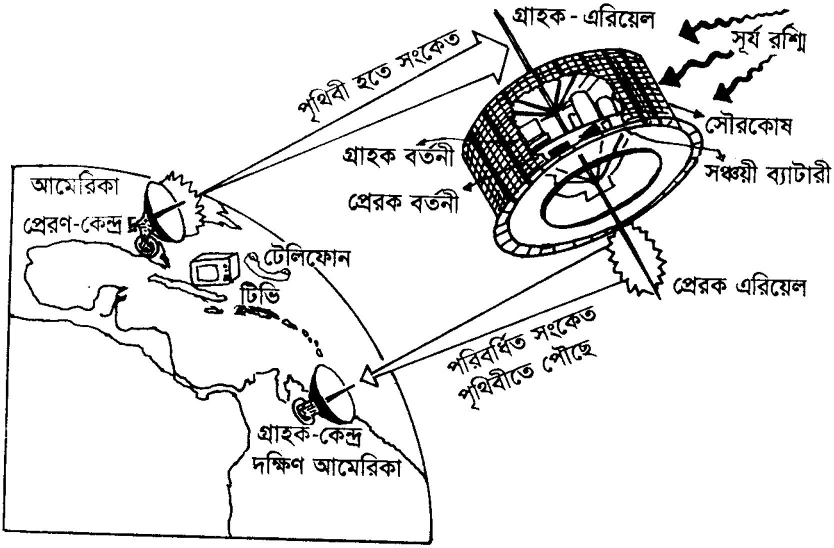
গ্রাহক - এরিয়েল
সূর্য রশ্মি
পৃথিবী হতে সংকেত
সৌরকোষ
গ্রাহক বর্তনী
সঞ্চয়ী ব্যাটারী
প্রেরক বর্তনী
আমেরিকা
প্রেরণ-কেন্দ্র
টেলিফোন
টিভি
প্রেরক এরিয়েল
পরিবর্ধিত সংকেত
পৃথিবীতে পৌঁছে
গ্রাহক-কেন্দ্র
দক্ষিণ আমেরিকা

[চিত্র ৬·৮]

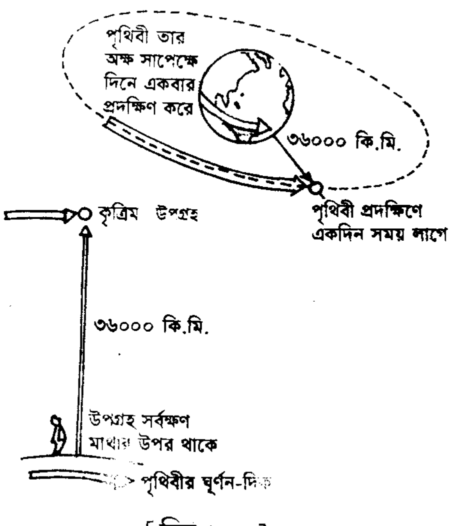
পৃথিবী তার
অক্ষ সাপেক্ষে
দিনে একবার
প্রদক্ষিণ করে
৩৬০০০ কি.মি.
কৃত্রিম উপগ্রহ
পৃথিবী প্রদক্ষিণে
একদিন সময় লাগে
৩৬০০০ কি.মি.
উপগ্রহ সর্বক্ষণ
মাথার উপর থাকে
পৃথিবীর ঘূর্ণন-দিক

[চিত্র ৬·৯]

মহাশূন্যে আলাদাভাবে তিনটি উপগ্রহ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে তাদের থেকে সংকেত গোটা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

এসব উপগ্রহ পৃথিবী-পৃষ্ঠের বিষুব রেখার উপর ৩৬ হাজার কিলোমিটার উর্ধে স্থাপিত হয়েছে। এই উপগ্রহ ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে। পৃথিবীও নিজস্ব অক্ষের সাপেক্ষে একবার আবর্তন করতে ঠিক একই সময় ব্যয় করে। ফলে পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহটিকে সব সময়ই একই জায়গায় স্থির মনে হবে (চিত্র ৬.৯ দ্রষ্টব্য)।

এই ধরনের উপগ্রহে শক্তির জন্যে সৌরকোষ, যোগাযোগের জন্য এন্টিনা এবং দিক বা স্থান সংশোধনের জন্য ক্ষুদ্র রকেট মোটর থাকে।

এখন দেখা যাক কিভাবে একটি টেলিফোন কল আমাদের দেশ থেকে লণ্ডনে পৌছে। যাদের I.S.D বা আন্তর্জাতিক টেলিফোন কানেকশন রয়েছে, তাঁরা সরাসরি নিজ-ডায়াল ঘুরিয়ে বিদেশের যে কোন নাম্বারের সাথে কথা বলতে পারেন। যাঁদের তা নেই তাঁরা অপারেটর বা আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তা করতে পারেন। যা হোক কলটি প্রথমে গ্রাহকের সেট থেকে তারযোগে স্থানীয় এক্সচেঞ্জে যায়। তারপর ক্ষুদ্র বেতার তরংগ হিসাবে বিনাতারে এক মাইক্রোয়েভ রিলে টাওয়ার থেকে অন্য রিলে টাওয়ারে যায়। এভাবে এই বার্তাকে চট্রগ্রামের উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ভূ-কেন্দ্র এই সংকেতকে মহাশূন্যে অবস্থিত উপগ্রহে প্রেরণ করে। দুর্বল সংকেতকে শক্তিশালী করার পর উপগ্রহ তা যুক্তরাজ্যের করণওয়ালে অবস্থিত Goonhilly Downs এর বিশাল এন্টিনার দিকে পাঠায়। এই এন্টিনা থেকে মাইক্রোওয়েভ হিসাবে তা লণ্ডন শহরের রিলে টাওয়ারে পৌছে। এরপর এই রিলে টাওয়ার থেকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং এক্সচেঞ্জ থেকে নির্দিষ্ট টেলিফোন সেটে পোঁছে। একই পথ দিয়ে ঐ টেলিফোন থেকে ফিরতি কথা আমাদের দেশে নির্দিষ্ট সেটে পৌছে। এভাবে আট হাজার কিলোমিটার দূরের টেলিফোন বার্তা প্রায় পঁচাত্তর হাজার কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করে।

পৃথিবী থেকে আগত সঙ্কেত উপগ্রহের এরিয়েল (আমেরিকায় এন্টিনা) গ্রহণ করে। পরে এই সঙ্কেত উপগ্রহের গা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে সঙ্কেতরূপে পৃথিবীর দূর প্রত্যন্তে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে আসার সময় দুর্বল হয়ে পড়লেও পৃথিবীস্থ গ্রাহককেন্দ্র তাদেরকে সংগ্রহ করে এবং অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে শক্তি বিবর্ধিত

করে। ভারত মহাসাগরের উপরে বিষুবরেখো বরাবর INTELSAT উপগ্রহ থেকে বাংলাদেশে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এভাবেই দূর দূরান্তের টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিভিশন বার্তা আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

এভাবেই যোগাযোগ উপগ্রহ এই বিশাল পৃথিবীকে আমাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে NASA জুলাই ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত ল্যাণ্ডস্যাট নামক ৫টি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। এগুলি ভূ-পৃষ্ঠের ম্যাপ তৈরি করা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্‌ঘাটন, শস্য-সম্পদের জরীপ ও আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য ও পূর্বাভাষ দানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশ এধরনের তথ্য লাভ করে উপকৃত হচ্ছে। প্রথম তিনটি ল্যাণ্ডস্যাট উপগ্রহ RBVC (Return Beam Vidicon Camera) ও MSS (Multispectral Scanner) নামক দুটি যন্ত্রদ্বারা সজ্জিত ছিল। এই যন্ত্রগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণ ও নানান ধরনের উপাত্ত সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়। ল্যাণ্ডস্যাট-৪ সহ অন্যান্য উপগ্রহে RBVC এর পরিবর্তে উন্নততর এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য যন্ত্র TM (Thematic Mapper) দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

ল্যাণ্ডস্যাট-৪ [চিত্র ৬.১০] ও ল্যাণ্ডস্যাট-৫ কে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৭০৫ কি.মি. দূরবর্তী বৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এগুলি প্রতি ৯৮.৯ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। প্রতি ১৬ দিনে এগুলি গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠের তথ্য ও ছবি ম্যারিল্যাণ্ডে অবস্থিত গডার্ড স্পেস কেন্দ্রে পাঠায় এবং প্রয়োজনমতো বিদেশের অন্যান্য ভূ-পৃষ্ঠের কেন্দ্র থেকেও তা সরাসরি সংগ্রহ করা যায়।

১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ল্যাণ্ডস্যাট-৪ উক্ষেপণ করা হয়। এটি তৈরি করতে ৫.৩ কোটি ডলার এবং উৎক্ষেপণ করতে ৩.৬ কোটি ডলার খরচ হয়। দূর্ভাগ্যবশত উৎক্ষেপণের পরে এর দুটি সৌর-কোষ প্যানেল কাজ না করায় এটি অর্ধেক শক্তি হারায়। ফলে MS নামক যন্ত্রটিকে বন্ধ রেখে শক্তি সাশ্রয় করা হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের পরে ল্যাণ্ডস্যাট-৩ আর কার্যক্ষম থাকে না। ১৯৮৪ এর দিকে ল্যাণ্ডস্যাট-৫ উৎক্ষেপণ করা হয়।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাদের ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে EOSAT নামক ব্যক্তিমালিকানাধীন এক কোম্পানিকে ল্যাণ্ডস্যাট-৪ ও ল্যাণ্ডস্যাট -৫ এর পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া

হয়েছে। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ল্যাণ্ডস্যাট-৬ উৎক্ষেপণ করার কথা। সৌরকোষ সজ্জিত এসব কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের অশেষ কল্যান সাধন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

সৌর কোষের ব্যবহার শুধু কৃত্রিম উপগ্রহেই সীমাবদ্ধ নেই—পৃথিবীতে এর বহুবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। জাপানে পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত একটি রেডিও রিলে স্টেশনে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য একসারি সৌর কোষ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে সম্প্রতি স্থাপিত পাঁচটি সৌর কোষ চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র কাজ করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সৌর-কোষ সজ্জিত ছোট ছোট ট্যানজিস্টার-রেডিও আজকাল

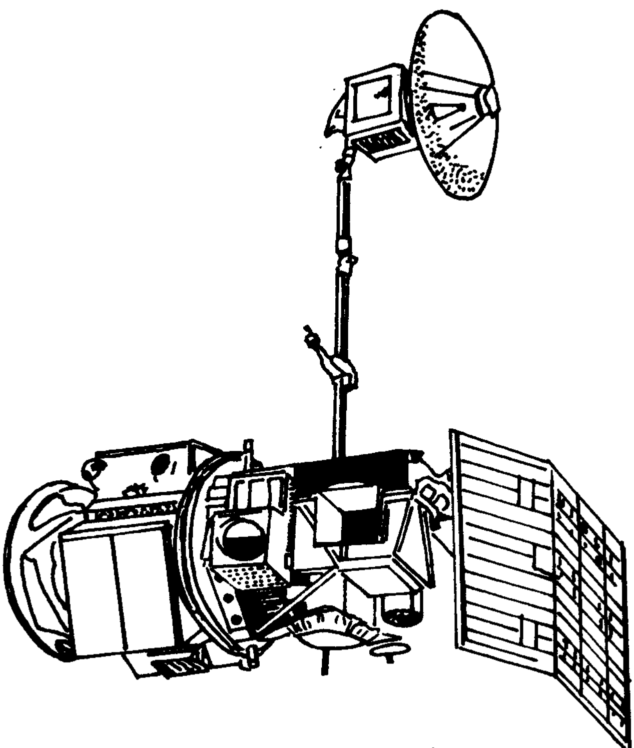

[চিত্র ৬.১০ : ল্যান্ডস্যাট-৪]

[চিত্র ৬.১০]

বিক্রি হচ্ছে। এবং এক ধরনের টর্চ–ব্যাটারি দিনে সৌরশক্তি সঞ্চয় করেও রাতে এগুলি পথিপার্শ্বে ল্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অর্ধপরিবাহী ডিটেক্টর

বিশুদ্ধ সিলিকন–পাতের দুই সমতলে অতি পাতলা স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই দুই পরিবাহী তলের সাথে একটি ১–২০ ভোল্ট ব্যাটারি ও একটি বিবর্ধক সংযুক্ত করা হয়। কোন চার্জ যুক্ত কণা সিলিকনে প্রবেশ করলে সেখানে মুক্ত ইলেকট্রন ও হোল–এর সৃষ্টি হয় এবং কেলাসের পরিবাহিতাও বৃদ্ধি পায়। কণার সংখ্যা অনুসারে প্রবাহও কম–বেশি হবে। হঠাৎ পাওয়া এই প্রবাহকে বিবর্ধকের সাহায্যে শক্তিশালী ক'রে তা গণনাকারী যন্ত্রে পাঠানো হয়। এইভাবে আমরা কণার উপস্থিতি এবং তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারি।

একটি অতি সাধারণ অর্ধপরিবাহী ডিটেক্টর ৬·১১ নং চিত্রে দেখানো হলো।

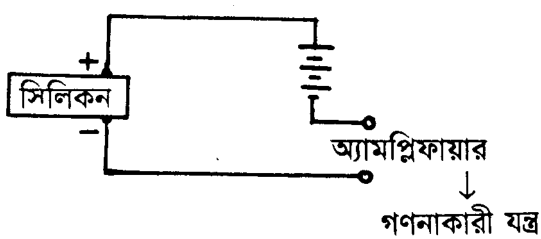

[চিত্র ৬·১১]

অর্ধপরিবাহী লেজার

অর্ধপরিবাহী লেজারে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পাম্পিং হয়। অন্যান্য লেজারে পরোক্ষভাবে এই পাম্পিং হয় অর্থাৎ একটি কেলাস লেজারে বৈদ্যুতিক শক্তি একটি ফ্লাশ ল্যাম্প জ্বালিয়ে দেয়। এই ল্যাম্প লেজার পদার্থকে উত্তেজিত করে। এদিক দিয়ে অর্ধপরিবাহী লেজার অন্যান্য লেজার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

একে 'ডায়োড” এবং 'ইঞ্জেকশন' লেজারও বলা হয়। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় রেডিকার, নাথান ও হল নামক বিজ্ঞানীত্রয় ইঞ্জেকশন লেজার আবিষ্কার করেন। এই লেজার আসলে p-n শ্রেণীর গ্যালিয়াম-আর্সেনাইড অর্ধপরিবাহী ডায়োড লেজার। একে অগ্রবর্তী বায়াসে রাখা হয়, আর ইঞ্জেকশন নামকরণ এই জন্যই হয়েছে যে, এখানে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ইঞ্জেক্ট করা হয়।

p-n জাংশন হচ্ছে এ ধরনের লেজারের মূল অংশ [চিত্র ৬.১২]। n-অংশ হতে মুক্ত ইলেকট্রন জাংশন অতিক্রম করে p-অংশের হোল-এর সাথে মিলিত হয়। জাংশন অঞ্চল অতিক্রমকালে মুক্ত ইলেকট্রন কিছু শক্তির অধিকারী হয় এবং যখন এটি হোল-এ মিলিত হয় তখন এই শক্তি নির্গত হয়। আলোক-কণিকা হিসাবে ফোটন রূপে শক্তির উদ্ভবই হচ্ছে অর্ধপরিবাহী লেজারের মূল কথা।

এই অর্ধপরিবাহী লেজার সরঞ্জামের n- অংশকে একটি ব্যাটারির নেগেটিভ ও p-অংশকে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। এখন বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা ক'রে ইলেকট্রনগুলিকে p-অঞ্চলে প্রবেশ করানো হয় এবং মুক্ত ইলেকট্রনগুলিকে জাংশনের দিকে পরিচালিত করা হয়। এভাবে ইঞ্জেকশন লেজার

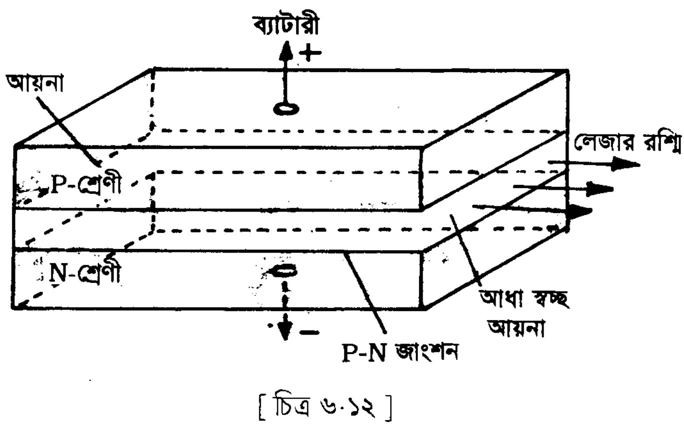

[চিত্র ৬·১২]

নামকরণ হয়েছে। জাংশন অঞ্চলে ইলেকট্রনগুলি হোল-এর সাথে একত্রিত হয়ে ফোটন বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করে। অন্যান্য ইলেকট্রনের সাথে এই

ফোটনের সংঘর্ষের ফলে আরো ফোটন তৈরি হয়। এসব ফোটন রেজোনেটর–আয়নাদুটির একটি হতে অন্যটির মধ্যবর্তী অংশে বহুবার দৌড়াদৌড়ি করে। এরফলে ক্রমাগত অধিক উচ্চশক্তি আলোকরশ্মির সৃষ্টি হয়। পরে এই তীব্র আলোক আধা স্বচ্ছ আয়নাটির মধ্য দিয়ে লেজার রশ্মি হিসাবে বাইরে আসে। এভাবে মিলিওয়াট থেকে কয়েকওয়াট শক্তির লেজার রশ্মি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, জাংশনের পরস্পর বিপরীত দিককে উপযুক্তভাবে মসৃন করলে তা' আয়না হিসাবে কাজ করে।

এ ধরনের লেজারে খুবই কম শক্তির দরকার পড়ে। ফলে এগুলি থেকে কম শক্তির লেজার রশ্মি পাওয়া যায়—তথাপি কম শক্তির এই লেজার যোগাযোগের জন্য উত্তম। রশ্মি সাধারণত বর্ণালীর 'ইনফ্রারেড' বা অবলোহিত অংশে থাকে। যোগাযোগের কাজে লেজারকে সবদিক দিয়ে আরো উপযোগী করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে এখনো গবেষণা চলছে। মহাশূন্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণের জন্য আমেরিকার জাতীয় মহাশূন্য বিজ্ঞান সংস্থা এক চুক্তির অধীনে আই.বি.এম কর্পোরেশনকে নিয়োগ করেছে।

বেতার তরঙ্গ উৎপাদক যন্ত্রেও 'কোহেরেন্ট' বা সুসঙ্গত বিকিরণ হয়। অস্‌সিলেটরে তৈরি তড়িৎ–চুম্বকীয় তরঙ্গ সুসঙ্গত বলে এরা একে অপরকে বাতিল করে না। ফলে এদের ফ্রিকোয়েন্সি ও বিস্তারের পরিবর্তন ক'রে এদের উপর শব্দ সঙ্কেত (বা অন্য কোন সঙ্কেত) চাপানো যায়—এই পদ্ধতিকে 'মডিউলেশন' বলা হয়। লেজার–রশ্মি–তরঙ্গকেও একই ভাবে মডিউলেশন করা সম্ভব।

একদিকে ধ্বংসাত্মক মারণ–রশ্মি হিসেবে লেজার যেমন ব্যবহৃত হতে পারে, অন্যদিকে তা প্রয়োগ করা যায় আরো বহু ধরনের সৃষ্টিশীল কাজে। অদূর ভবিষ্যতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেজারের গুরুত্ব বাড়বে আশা করা যাচ্ছে। কারণ লেজার–উৎপন্ন আলোক–রশ্মি অত্যন্ত সরু হলেও এর চ্যানেল ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। কেলাস ও অর্ধপরিবাহী লেজারই শুধু নয়, আরো বহু ধরনের লেজার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনবে এ সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া যাক।

লেজারের উন্নতির আগে দুই লক্ষ মেগাসাইকেল প্রশস্তের (band width) বেশি ফ্রিকোয়েন্সি উৎপন্ন করতে হিমসিম খেতে হয়েছে। লেজারে উৎপন্ন

(দৃশ্যমান) আলোক-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪০০০×১০^{-৮} সে. মি. হতে ৭০০০×১০^{-৮} সে.মি. অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি ৪৩ কোটি মেগাসাইকেল্স হতে ৭৫ কোটি মেগাসাইকেল্স। অর্থাৎ লেজার রশ্মির ফ্রিকোয়েন্সি সীমা (frequency band) হচ্ছে ৩২ কোটি মেগাসাইকেল্স—এই সীমা বর্তমানে মোট লভ্য ফ্রিকোয়েন্সি সীমার ষোলশ' গুণ বেশি। এ থেকে অতি সহজেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেজার রশ্মির গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে। লেজারে উৎপন্ন ফিকোয়েন্সি টেলি-যোগাযোগের কাজে লাগনো হ'লে ৩০ কোটি মেগাসাইকেলস ফিকোয়েন্সী সীমায় ৩০০০ সাইকেল্স প্রশস্তের প্রায় দশ হাজার কোটি টেলিফোন চ্যানেল অথবা ৬ মেগাসাইকেল্স প্রশস্তের পাঁচ কোটি নতুন টেলিভিশন চ্যানেলের স্থান সঙ্কুলান হবে।

বর্তমানে দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ ছাড়াও আরো বহু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মির লেজার উৎপন্ন হয়।

'ফাইবার অপটিক' টেলিফোন যোগাযোগে অর্ধপরিবাহী লেজার একটি অপরিহার্য অংগ। বহু কিলোমিটার দীর্ঘ অপটিক্যাল ফাইবার (optical fibre) এর মধ্য দিয়ে বার্তা (signal) পাঠানোর কাজে এই লেজার খুবই কার্যকরী। এক্ষেত্রে লেজার বীম-এর মাধ্যমে একসাথে শত শত এমনকি হাজার হাজার টেলিফোন কল করা যায়। পাশ্চাত্যের অনেক শহরে এমনকি এক শহর থেকে অন্য শহরে যোগাযোগের কাজে এ ধরনের টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের তল দিয়েও এভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিক হতে TAT-৮ নামে পরিচিত টেলিফোন কেবল আটলান্টিকের ভিতর দিয়ে দুই মহাদেশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

তথ্যের আদান-প্রদান, বিন্যাস বা বিশ্লেষণের কাজে লেজারের ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পাশ্চাত্য-জগতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ 'ডিস্ক (Compact Disk) অডিও প্লেয়ারে' লেজার দ্বারা সংগীত বাজানো হচ্ছে। অতিক্ষুদ্র সেমিপরিবাহী থেকে প্রাপ্ত অবলোহিত লেজার রশ্মি এধরনের প্রতিফলক ডিস্ক থেকে কাল দাগ হিসাবে রেকর্ডকৃত বাণী উদ্ধার করে মনোরম সংগীতের সূচনা করে। অতি ক্ষুদ্র আয়তনের ($১০^{-৬}$ মি × $১০^{-৬}$ মি) বিন্দুতে এই লেজার রশ্মি

BANSDOC Library Dhaka

ফোকাস করা সম্ভব। ফলে মাত্র ১২ সে.মি ডিস্কে ৭৫ মিনিটের সংগীত রেকর্ড আজ আর অসম্ভব কিছুই নয়।

আজকাল কম্পিউটার প্রিন্টারের মধ্যমনি হচ্ছে লেজার প্রিন্টার। ছোট ফটোকপি মেশিনের মতো দেখতে হলেও কার্যক্রমের দিক থেকে এগুলি ফটোকপি মেশিন বা সাধারণ প্রিন্টার থেকে অনেক আলাদা। এখানে কম্পিউটার মেমোরি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অর্ধপরিবাহী লেজার রশ্মি দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে ছাপা খুবই উচ্চমানের হয়ে থাকে। লেজার প্রিন্টারের মূল্য কিছুটা বেশি হলেও অতিদ্রুত ঝকঝকে ছাপার জন্য এগুলি খুবই জনপ্রিয়।

লেজার ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো লেজার চলাচলের মাধ্যমে। কারণ দূরবর্তী ষ্টেশনে পাঠানোর সময় বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, কুয়াশা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৈষম্য ইত্যাদির জন্য লেজার রশ্মির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শোষিত হয়ে যায়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমানে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।

একটি জেমিনী প্রজেক্টের দু'জন নভোচারীর মধ্যে একজন GaAs লেজার ট্রান্সমিটার পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট গ্রাহক যন্ত্র-মুখী ক'রে ৩০ সেকেণ্ড ধরে সঙ্কেত আদান-প্রদান করে মহাশূন্যযান থেকে পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের কার্যকারিতা সম্পর্কে পরীক্ষা করেন।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেজারের যে সমস্ত অসুবিধা এখনো রয়েছে' শীঘ্রই দূরীভূত হবে এবং তা যদি হয়, তবেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরো বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হবে।

আগামী বছরগুলোতে লেজার রশ্মি আমাদের জন্য আরো অনেক বেশি কাজে ব্যবহৃত হবে। জামা-কাপড়ের মাপ নিয়ে সেটি ঠিকমত কেটে পোষাক তৈরি, ষ্টোরে বিক্রয় ফর্দ তৈরি ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণ, ভূ-ভাগের সূক্ষ্ম কম্পন সম্পর্কে আগাম বার্তা—এছাড়া আরো কত কী যে কাজ লেজার দ্বারা করা সম্ভব তা' বোধ হয় এখন এখানে বলে শেষ করা যাবে না।

হলোগ্রাফী হচ্ছে আলো নিয়ে বিজ্ঞানের দারুণ এক মজার খেলা। এটি হচ্ছে এক ধরনের ফটোগ্রাফী এবং কৌশল খাটিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে এক ধরণের স্থায়ী ছাপ ফেলা হয়। এখানে ক্যামেরার দরকার নেই, নেই কোন লেন্সের দরকার।

হলোগ্রাম বা স্থায়ী ছাপের উপর লেজার রশ্মি ফেললেই তবেই ওই ছবি চমৎকারভাবে ফুটে উঠবে। কোনও ছবিতে যদি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটেই দেখতে চাই তবে বাস্তবে খালি চোখে আমরা যেমনটি দেখি ঠিক তেমনটিই এখানে দেখা যাবে। এটিই হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ছবি। ব্যাপারটি আসলেই অবিশ্বাস করার মতো। হলোগ্রাফিক এই ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে যিনি সারা পৃথিবীতে সারা জাগিয়েছিলেন তিনি হলেন লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডেনিস গ্যাবর। এজন্য তিনি ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

সাত

ট্রানজিস্টার-জগৎ

ট্রানজিস্টার বলতে অনেকেই হয়তো শুধুমাত্র ড্রাইসেল ব্যাটারি-চালিত রেডিও গ্রাহক-যন্ত্র বুঝে থাকে। আসলে ট্রানজিস্টার কিন্তু তা' নয় বরং এটি হচ্ছে 'ইলেকট্রনিক ভালভের সর্বাধুনিক প্রতিকল্পরূপ'। জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে ট্রানজিস্টার তৈরি হয়। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ট্রানজিস্টার আবিষ্কৃত হয়েছে ; আর এতে ক'রে 'অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিকস' এর জগতে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই সাধানার ফল আমাদের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে আর আমরা তার সুফল ভোগ করে চলেছি।

এবার দেখা যা'ক এই ট্রানজিস্টার কী? আর এর ক্রিয়াপদ্ধতিই বা কী রকম? তিনটি অর্ধপরিবাহী উপাদানের সহযোগে একটি ট্রানজিস্টার তৈরি হয়। এক্ষেত্রে একটি p- শ্রেণীর অর্ধপরিবাহী কেলাস n- শ্রেণীর অর্ধপরিবাহী কেলাসে অথবা একটি n- শ্রেণীর কেলাস দু'টি p- শ্রেণীর কেলাসের মধ্যে সংস্থাপিত থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় সমন্বয়কে যথাক্রমে n-p-n ও p-n-p ট্রানজিস্টার বলা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ট্রানজিস্টার বিবর্ধক অর্ধপরিবাহী সরঞ্জামের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন। ট্রায়োডের ন্যায় কাজ করে বলে এটি ট্রায়োডের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

গঠন-রীতি অনুসারে ট্রানজিস্টার দুপ্রকারের ঃ (১) বিন্দু স্পর্শ ট্রানজিস্টার এবং (২) সংযোগ ট্রানজিস্টার।

বিন্দু-স্পর্শ ট্রানজিস্টার

রাশিয়ার বিজ্ঞানী লোজেভ 'নিঝ্‌নি নভ্‌গরোদ' নামক স্থানে কাজ করার সময় সর্বপ্রথম দু'টি ক্যাট-হুয়িস্কারকে একটি কেলাসে সংযুক্ত ক'রে তাকে ব্যবহার করে

ভাল ফল পান। বলা যায় যে, এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক ট্রানজিস্টারের জনকের কাজটি সমাপ্ত করেন। লোজেভের এই মূল ট্রানজিস্টার মূলত বিন্দু-স্পর্শ ট্রানজিস্টার। একটি পাতলা জার্মেনিয়াম কেলাসের উপর খুব কাছাকাছি দু'টি বিন্দুতে সূক্ষ্ম ধাতব তার E এবং C স্পর্শ করে থাকে। কেলাসের নিচে একটি ধাতব পাতলা ঝালাই করা থাকে। একে বেস বা ভূমি (B) বলে। অপর দুই বিন্দু E ও C যথাক্রমে ইমিটার বা নিঃসারক এবং কালেক্টর বা সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করে (চিত্র ৭.১)। এ ধরনের ট্রানজিস্টার ভাল্‌ভের কাজ ক'রে থাকে।

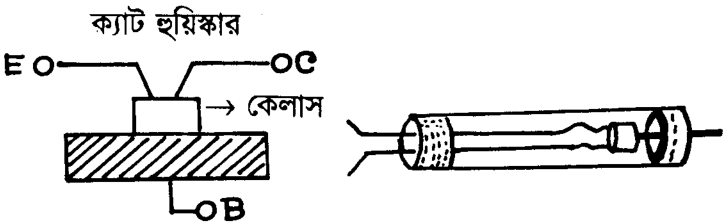

[চিত্র ৭·১]

সংযোগ ট্রানজিস্টার

দু'টি সমশ্রেণীর অর্ধপরিবাহীর মাঝে বিপরীত শ্রেণীর অতীব হালকা কেলাস সংযুক্ত ক'রে এ জাতীয় ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয়।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাটেন, বার্ডীন ও শক্‌লি নামক তিনজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সংযোগ ট্রানজিস্টার আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ডব্লিউ. এইচ. ব্রাটেন ও জে. বার্ডীন 'দি ট্রানজিস্টার' নামক এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর পরের বছর ডব্লিউ. শক্‌লি ট্রানজিস্টারের আরো কিছু উন্নততর কাজ যোগ করেন। আর এভাবেই ট্রানজিস্টার জন্ম লাভ করে। তাঁরা সকলেই তখন আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। আর ট্রানজিস্টার আবিষ্কার ও এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য এঁরা তিনজনেই ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সংযোগ ট্রানজিস্টার দু'ধরনের হতে পারে ঃ (১) n-p-n ট্রানজিস্টার এবং (২) p-n-p ট্রানজিস্টার।

দু'টি n-শ্রেণীর কেলাসের মধ্যে একটি p-শ্রেণীর পাতলা কেলাস যুক্ত হ'লে তাকে n-p-n ট্রানজিস্টার বলে। আর দু'টি p-শ্রেণীর কেলাসের মধ্যে একটি n-শ্রেণীর পাতলা কেলাস যুক্ত হলে তাকে p-n-p ট্রানজিস্টার বলে।

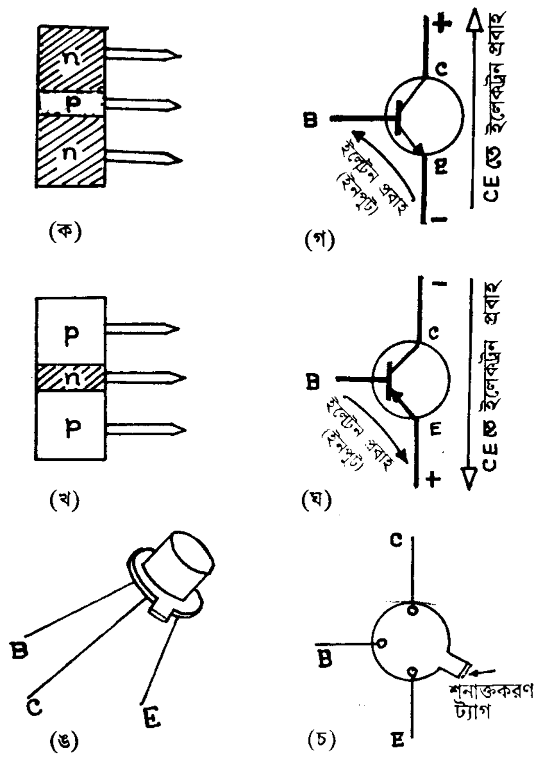

[চিত্র ৭·২]

৭-২ নং চিত্রে একটি n-p-n ও একটি p-n-p সংযোগ ট্রানজিস্টার দেখানো হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই মাঝের অংশকে ভূমি (B), প্রান্তের অংশদ্বয়কে যথাক্রমে

নিঃসারক (E) এবং সংগ্রাহক (C) বলা হয়ে থাকে। তিন অংশই একটি ধাতব বা গ্লাসের পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। আর এর এক দিক থেকে B, E ও C - এর সাথে সংযুক্ত তিনটি ধাতব তার বের হয়ে থাকে। কোন বর্তনীতে ট্রানজিস্টারের সংযোগের জন্য এই তিনটি তার ব্যবহৃত হয়। চিত্রে গ ও ঘ দ্বারা এই দু'ধরনের ট্রানজিস্টারের প্রতীক দেখানো হয়েছে। নিঃসারককে সব সময় তীর চিহ্ন দেওয়া হয়। এই চিহ্ন ভূমি-নিঃসারকের মধ্যে প্রচলিত প্রবাহ দিক (conventional current) নির্দেশ করে। উল্লেখ্য এটি ইলেকট্রন প্রবাহের উল্টো দিক। ঙ-তে একটি ট্রানজিস্টারের প্রকৃত রূপ দেখানো হয়েছে। বর্তনীতে তিন পায়ার সঠিক সংযোগ না হলে ট্রানজিস্টার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য কোন পায়াটি C, B বা E তা' বোঝার জন্য এতে সনাক্তকরণ ট্যাগ' থাকে। নিচ দিক থেকে লক্ষ্য করলে একটি ট্রানজিস্টারের বাহু তিনটির অবস্থান কি হবে তা চিত্র চ-তে বুঝানো হয়েছে।

৭.৩ নং চিত্রে বর্তনীতে একটি n-p-n সংযোগ ট্রানজিস্টার কিভাবে কাজ করে তা বলা হচ্ছে। প্রয়োগ প্রান্তের n- শ্রেনীর কেলাসটি B এর তুলনায় নেগেটিভ বিভবে থাকায় ইলেকট্রন মধ্যবর্তী p- শ্রেণীর কেলাসের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু

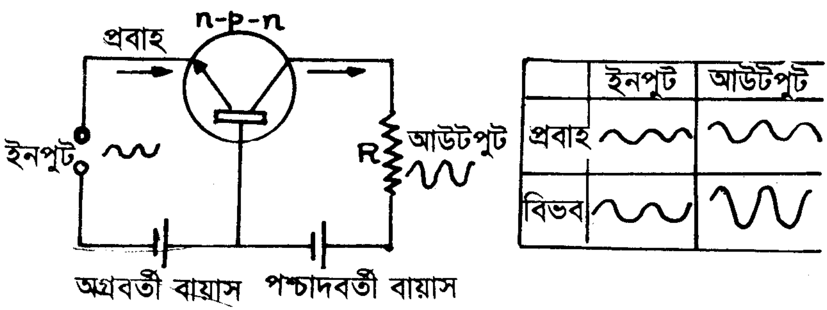

[চিত্র ৭.৩]

p- শ্রেণীর কেলাসে কম সংখ্যক পজিটিভ হোল (যেহেতু p- অংশ খুবই পাতলা) থাকায় ঐ ইলেকট্রন প্রবাহের সামান্য অংশই হোল-এর সাথে মিলিত হ'য়ে এদেরকে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ করে। ফলে অধিকাংশ ইলেকট্রনই n- এর দিকে ধাবিত হয়। n- এর সাথে ব্যাটারি পজিটিভ বিভব যুক্ত থাকায় এই ইলেকট্রনগুলি আরো

বেগে ধাবিত হয় ; ফলে বহিঃস্থ বর্তনীতে প্রবাহ চলে এবং আউটপুটের রোধক R-এর উপর উচ্চ বিভব উৎপন্ন হয়। একটি n-p-n সংযোগ ট্রানজিস্টারের কার্যক্রমকে কোন নল থেকে নির্গত পানির জেটের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

নলের ভিতর দিয়ে পানি খুব বেগে প্রবহিত হ'লে তা' কিছুক্ষণ পর্যন্ত সোজাসুজিই (সরল রেখায়) নিক্ষিপ্ত হবে। ৭·৪ নং চিত্রের ন্যায় দেওয়ালের অল্প দূরে একটি তার (B) এবং মাটি হতে কম নিচুতে অথচ দেওয়াল হতে অপেক্ষাকৃত

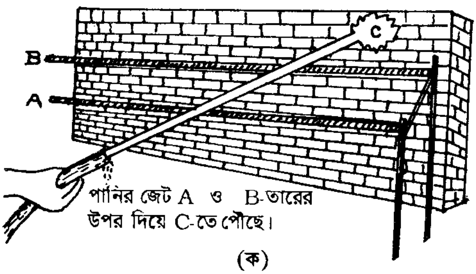

(ক)

(খ)

[চিত্র ৭·৪ ক, খ]

বেশি দূরে অপর একটি তার (A) টাঙ্গানো আছে। আর A থেকে অল্প দূরে অথচ নিচুতে অবস্থিত নল থেকে নিক্ষিপ্ত জেট (ক)চিত্রের ন্যায় A ও B তারের উপর দিয়ে দেওয়ালের C জায়গায় গিয়ে পড়বে। চাপের দরুনই পানি বেগে নিক্ষিপ্ত হয় এবং নল থেকে বের হ'য়ে আসা পানির প্রায় সবটুকুই দেওয়ালে পৌছে।

ট্রানজিস্টারে ইলেকট্রন প্রবাহ বহিঃবর্তনীর ব্যাটারি প্রদত্ত বৈদ্যুতিক চাপ দ্বারা পরিচালিত হয়। আর এই চাপের ফলে প্রবাহ প্রথম সংযোগের নিম্নতর প্রাচীর বা বাঁধা উৎরে দ্বিতীয় সংযোগের উচ্চতর প্রাচীর পার হয়। নিঃসারক থেকে প্রবাহিত প্রায় সব ক'টি ইলেকট্রনই সংগ্রাহককে পৌছে।

এখন নলটিকে উপর-নিচের দিকে সামান্য একটু নাড়া দেওয়া হয় এবং লক্ষ্য রাখা হয় যাতে ক'রে পানি বাধা A ও B কে অতিক্রম করে। নল-প্রান্তের খুব সামান্য অবস্থান পরিবর্তনের জন্য দেওয়ালের কাছের পানির আন্দোলন খুবই বেশি হয়। এক্ষেত্রেও যেটুকু পানি নল দিয়ে বেরিয়ে আসে তার প্রায় সবটুকুই দেওয়ালে পৌছে।

অনুরূপভাবে, একটি ট্রানজিস্টারের নিঃসারক ও ভূমির (নল-প্রান্ত) বিভবের সামান্য পরিবর্তন সংগ্রাহক ও ভূমির (দেওয়াল-প্রান্ত) মধ্যেকার বিভবের যথেষ্ট পরিবর্তন করে।

এভাবেই একটি n-p-n ট্রানজিস্টার বিভব বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু প্রবাহ-মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।

ট্রানজিস্টারকে বিদ্যুৎ প্রবাহ ও শক্তি বিবর্ধক হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব। [

ট্রানজিস্টার ও ট্রায়োডের সমতুল্যতা

তোমাদের মধ্যে যারা রেডিওর প্রতি আগ্রহশীল তারা নিশ্চয়ই ট্রায়োড ভাল্‌ভযুক্ত বেতার যন্ত্র দেখে থাকবে। ট্রায়োড ভালভের পরিবর্ধন ক্ষমতা আছে এবং ডায়োড ভাল্‌ভ অপেক্ষা ট্রায়োডের কাজ সন্তোষজনক। ভাল্‌ভযুক্ত বেতারযন্ত্র আকারে বেশ বড় হয়ে থাকে। আকারে ছোট ও অন্যান্য সুবিধার অন্য আজকাল বেতার-যন্ত্রে ট্রানজিস্টারের ব্যবহারই বেশি প্রচলিত।

তড়িদ্‌দ্বারগুলির কার্যপ্রালী লক্ষ্য করলে ট্রানজিস্টার ও ট্রায়োড ভাল্‌ভকে সমতুল্য মনে করা যেতে পারে। ট্রায়োড ভাল্‌ভে ক্যাথোড হতে ইলেকট্রন বের হয়ে গ্রিডের মধ্য দিয়ে প্লেটে পৌছে। n-p-n ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে নিঃসারক হ'তে ইলেকট্রন বের হয়ে অবশেষে সংগ্রাহকে পৌছে। সুতরাং ট্রানজিস্টারের নিঃসারক ও সংগ্রাহককে যথাক্রমে ট্রায়োডের ক্যাথোড ও প্লেটের সমতুল্য ধরা যেতে পারে।

আবার ট্রানজিস্টারের ভূমির প্রবাহ-মাত্রা (base current) পরিবর্তন করলে নিঃসারক-ভূমি সংযোগের বিভব-প্রাচীর পরিবর্তিত হ'য়ে প্লেট প্রবাহকেও পরিবর্তন করতে থাকবে। সুতরাং ভূমিকে ট্রায়োডের নিয়ন্ত্রণ-গ্রিডের সমতুল্য বলা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ট্রায়োডের অ্যানোড, ক্যাথোড ও নিয়ন্ত্রণ গ্রিড যথাক্রমে ট্রানজিস্টারের সংগ্রাহক, নিঃসারক ও ভূমির সমতুল্য।

ট্রানজিস্টারের বিন্যাস

বর্তনীতে প্রয়োজন অনুযায়ী তিন প্রকারে ট্রানজিস্টারের বিন্যাস করা হয়ে থাকে ঃ

১. **সাধারণ-ভূমি** ঃ এই বিন্যাসে ভূমি ও নিঃসারক নিয়ে ইনপুট (প্রয়োগপ্রান্ত) এবং ভূমি ও সংগ্রাহক নিয়ে আউটপুট প্রান্ত গঠিত হয়। উভয় প্রান্তের সাথে ভূমি সংযুক্ত থাকে বলে একে সাধারণ ভূমি বলে।

২. **সাধারণ-নিঃসারক** ঃ এই ব্যবস্থায় ভূমি ও নিঃসারক নিয়ে ইনপুট প্রান্ত এবং নিঃসারক ও সংগ্রাহক নিয়ে আউটপুট প্রান্ত গঠিত। উভয় প্রান্তের সাথে নিঃসারক যুক্ত থাকে।

৩. **সাধারণ সংগ্রাহক** ঃ এখানে উভয় প্রান্তের সাথে সংগ্রাহক যুক্ত থাকে। ভূমি ও সংগ্রাহক নিয়ে ইনপুট আর সংগ্রাহক ও নিঃসারক নিয়ে আউটপুট প্রান্ত গঠিত হয়।

ভাল্‌ভ বনাম ট্রানজিস্টার

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের আগে ভাল্‌ভের সত্যিকার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। কিন্তু আবিষ্কারের বছর দুয়েকের মধ্যেই বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের বিবর্ধনের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো একটি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটল। অতি সত্বর ট্রানজিস্টার তার পূর্বসুরীর আসন অধিকার করে নিল। প্রায় সব ধরনের ব্যবহারে ট্রানজিস্টার ভাল্‌ভকে টেক্কা দিতে লাগলো এবং এতে করেই ট্রানজিস্টার বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। ট্রানজিস্টারের আধিপত্যের বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ট্রানজিস্টার ভাল্‌ভ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য—আবিষ্কারের এক দশক পরেই এটি দশগুণ বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

ভাল্‌ভকে ইলেকট্রন পেতে হয় ক্যাথোড থেকে—গ্রিড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই ইলেকট্রন প্রবাহ। কাথোড থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইলেকট্রন বের করতে একে অবশ্য গরম করতে হয়—উত্তপ্ত ফিলামেন্ট দ্বারা একে গরম করা হয় আর এজন্য খরচের প্রয়োজন পড়ে। ফিলামেন্ট জ্বলে উঠলে এটি গরম হয় এবং নিভে গেলে ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা-গরমের জন্য ভাল্‌ভের বিভিন্ন অংশের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ হয়। এতে করে যান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। আর বেশির ভাগ অচলাবস্থাই সৃষ্টি হয় ফিলামেন্টে —আবার কখনও অন্য স্থানে।

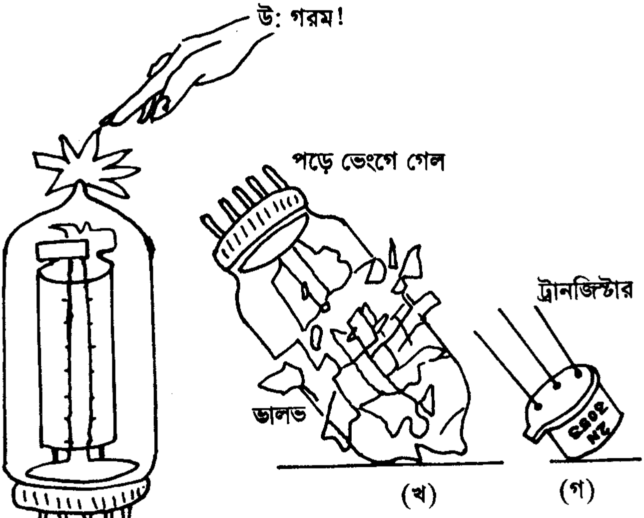

[চিত্র ৭·৫]

ট্রানজিস্টার ইলেকট্রন (বা হোল) বস্তুস্তূপের মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার দ্বারা ইচ্ছামতো তাদের গতিশীল করা যায়—উত্তাপ দ্বারা মুক্ত করার প্রয়োজন হয় না। অতএব ট্রানজিস্টারের [illegible] শক্তির কার্যকারিতা খুব বেশি। এটা এমনভাবে তৈরি করা সম্ভব যার [illegible] ক্ষমতা তাত্ত্বিক আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।

ট্রানজিস্টারে বিদ্যুৎ খরচ কম। ভাল্‌ভে বিদ্যুৎ খরচ বেশি—আর বিদ্যুৎ খরচ ক'রে অনর্থক তাপ সৃষ্টির ঝামেলা পোহাতে হয়। ভাল্‌ভ ব্যবহারকারী রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে আরো বহু বড় বড় জটিল যন্ত্রপাতিতে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় উত্তাপের হাত থেকে রেহাই পাওয়াও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যারা ভাল্‌ভসহ রেডিও বা টেলিভিশন দেখেছে তারা জানে এখানে কি পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয়। আর যেখানে শত শত ভাল্‌ভের প্রয়োজন হয় সেখানে যে কি পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই ভাল্‌ভ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির উত্তাপ হতে রেহাই পাবার জন্য বিশেষ শীতলকারক সরঞ্জামের ব্যবহার করতে হয়।

একটি সাধারণ ভাল্‌ভের গড়পড়তা আয়ু প্রায় দশ হাজার ঘন্টা। কোন বাড়ির রেডিও-টেলিভিশনের জন্য এই সময়ই যথেষ্ট। কারণ একটি রেডিও বা টেলিভিশন বছরে কয়েকশ' থেকে এক হাজার ঘন্টার মতো ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শিল্প বা সামরিক ক্ষেত্রে অধিক আয়ুর নির্ভরযোগ্য যন্ত্রাংশের দরকার। নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টার অগ্রগামী—আর ইতিমধ্যেই সে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে। অর্ধ-পরিবাহী প্রকৌশল-বিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে তার আয়ুষ্কাল দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণভাবে ট্রানজিস্টার তৈরির মূল উপাদান জার্মেনিয়াম। এটার কারণ হলো যে, জার্মেনিয়াম কেলাসকে সহজে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় ; আর তা ছাড়া সাধারণ তাপমাত্রায় এর কার্যকারিতা খুব ভাল। অবশ্য পরে যখন সিলিকন অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব হলো তখন ট্রানজিস্টার হিসেবে সিলিকনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে লাগলো। কারণ সিলিকন তুলনামূলকভাবে বেশি তাপমাত্রায় এর কার্যকারিতা অক্ষুন্ন রাখে।

ইলেকট্রন ভাল্‌ভের তুলনায় ট্রানজিস্টার এর উন্নততর ও বিবিধ কার্যকারিতা দ্বারা বিজ্ঞানের জগতে বিস্ময়কর অবদান রাখছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বহু ধরনের ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জামে ট্রানজিস্টার ব্যবহৃত হচ্ছে। ট্রানজিস্টারের আঁটসাঁট, নিবিড় ও শক্তিশালী গঠনই হালকা যন্ত্র তৈরির উপযোগী—আর এজন্য জন্মলগ্ন থেকেই ট্রানজিস্টারের চাহিদা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজকাল ছোট ছোট রেডিও, ভ্রাম্যমান যন্ত্র, অ্যামপ্লিফায়ার, বক্তৃতা দেবার যন্ত্র, পরীক্ষা-সরঞ্জাম, আবহাওয়া যন্ত্র, চলচ্চিত্র সরঞ্জাম, নিয়ন্ত্রণমূলক আরো বহু কাজ ট্রানজিস্টারের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ব্যবহার্য ট্রানজিস্টারওয়ালা ওয়াকি-টকি এতই ক্ষুদ্রায়তনের যে অল্প দূর থেকে তা' প্রায় দেখাই যায় না। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত বিভিন্ন বহনযোগ্য যন্ত্র যেমন টেপ রেকর্ডার, রেডিও, টেলিভিশন-সেট, মটর গাড়ির রেডিও ও পানিতে ব্যবহৃত রেডিওতে ট্রানজিস্টার ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দোষ-যুক্ত লোক তার শ্রুত শব্দের বিস্তারের জন্য এক ধরনের বিশেষ যন্ত্র কানে পরে থাকে। এগুলিও ট্রানজিস্টারের তৈরি।

এ ছাড়াও মহাকাশ গবেষণা, কৃত্রিম উপগ্রহ, সঙ্কেত আদান-প্রাদান, রাডার, টেলিভিশন, কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র, স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধবিমান প্রভৃতির কলা-কৌশলের সাফল্য ত্বরান্বিত করেছে এই ট্রানজিস্টার। ট্রানজিস্টারের ব্যবহার এত সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে যে এর অনুপস্থিতিতে ইলেকট্রনিক্সের বাহাদুরি একদম অচল।

বিদেশে নানাবিধ সাজ-সরঞ্জামের জন্য এই প্রয়োজনীয় জিনিসটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কম খরচে তৈরি করা হচ্ছে। আমরা আজও তাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল -কেননা একমাত্র ল্যাবরেটরি ছাড়া বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে ট্রানজিস্টার তৈরি করা আমাদের দেশে আজও সম্ভব হয়নি। অচিরেই যদি বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ না করা হয় তবে অন্যান্য আরো বহু ক্ষেত্রের মতো এখানেও আমরা বহু পিছনে পড়ে থাকবো।

আট

মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স রহস্য

ভাল্‌ভের পরিবর্তে ট্রানজিস্টারের ব্যবহারের ফলেই রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির আকার আয়তন আজ বহু গুণে ছোট হয়ে গেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে শুরু করে মনুষ্যবাহী মহাশূন্যযানে বহু জটিল যন্ত্রপাতি থাকে। এ সমস্ত যন্ত্রপাতিকে উপগ্রহ বা যানের গতি, চাপ, বিকিরণ, অবস্থান ইত্যাদি নির্ভুল তথ্যাদি এবং প্রয়োজনমতো চিত্র গ্রহণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধা করতে হয়—কিন্তু এসব স্বয়ংক্রিয় সাজ-সরঞ্জামের আকার আয়তন খুবই ছোট ও ওজনে অত্যন্ত হালকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিসেবে ক'রে দেখা গেছে যে মহাশূন্যযানের প্রতি ছটাক ওজন কমতির জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ বেঁচে যায়। কাজেই ক্ষুদ্রাকারের সাজ-সরঞ্জাম তৈরির গুরুত্ব অনেক বেশি। ক্ষুদ্রাকারে তৈরি এসব সাজ-সরঞ্জামে বিদ্যুৎ খরচও যথেষ্ট পরিমাণে কম। তাছাড়া এগুলি ততবেশি তাপও ছড়াবে না বলে খুবই নির্ভযোগ্য হবে। শুধু ভাল্‌ভের পরিবর্তে ট্রনিজিস্টার ও অন্যান্য অর্ধপরিবাহী সরঞ্জামের উদ্ভাবন করেই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হননি। যন্ত্রপাতির আরো ক্ষুদ্রীকরণেও তাঁরা বেশিদিন পিছিয়ে থাকেননি এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ইনটিগ্রেটেড-বর্তনীর' তথা "মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স' -এর উদ্ভব হয়।

বর্তমানে সাজ-সরঞ্জামের ক্ষুদ্রীকরণের ক্ষেত্রে 'ইনটিগ্রেটেড বর্তনী' (অখণ্ড বর্তনী) অর্ধপরিবাহীর সর্বশেষ ব্যবহার বলে মনে করা হয়। মাত্র কয়েক মিলিমিটার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি অর্ধপরিবাহী বস্তুর সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক বর্তনীর সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। এর জন্য আদি বস্তু হচ্ছে মাত্র একখণ্ড p-শ্রেণীর সিলিকন—একে বলা হয় চিপ (chip)। স্বতন্ত্রভাবে রোধক, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টার ও অন্যান্য বর্তনী-উপাদান তৈরির বদলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অপদ্রব্যের ক্রমিক মিশ্রণের দ্বারা ট্রানজিস্টার, ডায়োড, রোধক এবং তড়িৎ-ধারক প্রস্তুত করা হয়।

কাজেই রোধক, তড়িৎ-ধারক ট্রানজিস্টার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্তনী-উপাদান থেকে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা তৈরি না করে বরং অখণ্ড-বর্তনী থেকে তৈরি করা যায়—এ রকম প্রতিটি বর্তনীতে একটি মাত্র সিলিকন চিপে শত শত উপাদান থাকতে পারে। এভাবে তৈরি অখণ্ড বর্তনীকে আমরা শুধু "কালো বাক্স" হিসেবে গণ্য করতে পারি। কালো বাক্সের ভিতরে কি আছে বা না আছে তা না জেনেই এটাকে দিয়ে ইপ্সিত কাজ সমাধা করা সম্ভব। এটির ব্যবহার শুধু বিবর্ধকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—বরং বিশেষ কাজের জন্য তৈরি যে কোন ধরনের সূক্ষ্ম বর্তনীতে এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

পৃথক পৃথক বর্তনী-উপাদান দিয়ে তৈরি বর্তনীর অসুবিধা অনেক। তার মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

(ক) আলাদা আলাদা বর্তনী-উপাদান তৈরির ফলে বস্তু-উপাদানের অপচয়ের সাথে সাথে শ্রমেরও অপচয় হয়। তাছাড়া এদের দ্বারা তৈরি সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট বড় এবং ওজনেও ভারি হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি অর্ধপরিবাহী সিলিকন (বা অন্য কোন কেলাস) থেকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রানজিস্টার নির্মিত হয়। কোন বর্তনীতে ব্যবহার করতে হলে এটিকে একটি ধাতব পাত্র বা কোন প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র বড়ির মধ্যে আবদ্ধ করতে হয়। এজন্য উৎপাদন খরচ কমপক্ষে দশ গুণ এবং আয়তনও প্রায় দশ হাজার গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

(খ) পৃথক পৃথক উপাদান দিয়ে তৈরি বর্তনীতে বহু সংখ্যক সংযোগ-বিন্দু থাকে। অর্ধপরিবাহী-ট্রানজিস্টারের ভূমি, নিঃসারক ও সংগ্রাহক পৃষ্ঠে সাধারণত অতীব পাতলা ধাতব আবরণ দেওয়া হয়। এই ধাতব আবরণের সাথে অতি সুক্ষ্ম তার সংযুক্ত থাকে। সূক্ষ্ম তারের সাথে সংযুক্ত তিনটি মোটা তার ট্রানজিস্টারের ধাতব পাত্রের বাইরে থেকে দেখা যায়। বর্তনীর অন্যান্য উপাদানের সাথে সংযুক্তির জন্য এসব তার ব্যবহার করা হয়। কাজেই একটি ট্রানজিস্টারের জন্য সর্বমোট নয়টি সংযুক্তির প্রয়োজন। বর্তনী-উপাদানের সংযোগ-বিন্দুর সংখ্যানুসারে খরচ ও শ্রম দুই বৃদ্ধি পায়। আর এ ধরনের সংযোগ বিন্দুর সংখ্যানুসারে খরচ ও শ্রম দুই বৃদ্ধি পায়। আর এ ধরনের সংযোগ বিন্দু সম্ভাব্য ত্রুটির উৎস। সুতরাং অর্থ, শ্রম আর নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে এ ধরনের বর্তনী কোনক্রমেই শ্রেয় নয়।

(গ) বিভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির তৈরি বর্তনী-উপাদানগুলির মধ্যে খুব একটা সামঞ্জস্য থাকে না। বর্তনী ডিজাইন করতে প্রায়ই এমন সব বর্তনী উপাদানের দরকার যেগুলির একটির সাথে আরেকটির ম্যাচিং বা সমন্বয় হওয়া বাঞ্ছনীয়—আর এজন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া বর্তনী -উপাদানগুলি ব্যয়সাধ্য উপায়ে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে তৈরি ও নির্বাচন করতে হয়।

অখণ্ড-বর্তনীর সম্পূর্ণ অংশ এক সাথে তৈরি করা হয়। কাজেই বর্তনী উপাদানগুলির মধ্যে হুবহু মিল না থাকলে যে অসুবিধা হয় এক্ষেত্রে তা স্বাভাবিকভাবেই হয় না। তাছাড়া অখণ্ড-বর্তনীর সমস্ত কিছু একটি ক্ষুদ্র সিলিকন কেলাসে হওয়ায় গোটা বর্তনী একই তাপমাত্রায় থাকে—একটি অখণ্ড বর্তনী ব্যবহারের এটি অন্যতম সুবিধা।

(ঘ) পৃথক পৃথক বর্তনী উপাদানের একের সাথে অপরের সংযুক্তির জন্য তার ব্যবহৃত হয়। এই তার অপেক্ষাকৃত লম্বা হওয়াতে তারের রোধ এবং স্বাবেশ নানা প্রকারের সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ফলে উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সিতে এগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বর্তনীর কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কিন্তু অখণ্ড বর্তনীতে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, অর্ধপরিবাহী নীতিকে শুধু মাত্র আলাদা আলাদা উপাদান তৈরি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি ; বরং ক্ষুদ্রতম অর্ধপরিবাহী বস্তুখণ্ড দিয়ে সম্পূর্ণ কোন বর্তনীর কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টার ফলেই ইলেকট্রনিক বর্তনীর আকার আয়তনের অধিকতর ক্ষুদ্রীকরণ সম্ভবপর হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তনী ও বর্তনী-উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। কেননা এখানে একটি অখণ্ড ক্ষুদ্র ইউনিটে গোটা একটি বর্তনীকে 'ইনটিগ্রেট' করা হয়েছে। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে এই ধারণাকে অতি সহজেই বুঝানো যেতে পারে ঃ

একটি সাধারণ ট্রানজিস্টার অ্যামপ্লিফায়ার বা বিবর্ধকের প্রচলিত বর্তনীতে ছ'টি উপাদান রয়েছে (চিত্র ৮.১ ক)। এগুলি পরস্পরের সাথে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত। একটি অর্ধপরিবাহী দণ্ডের সুনির্দিষ্ট বিদ্যুৎ রোধ ক্ষমতা আছে। একটি সংযোগকে তড়িৎ-ধারক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাজেই উল্লিখিত বর্তনী উপাদানগুলির প্রত্যেকটি অর্ধপরিবাহী থেকে তৈরি (fabricate) করা সম্ভব।

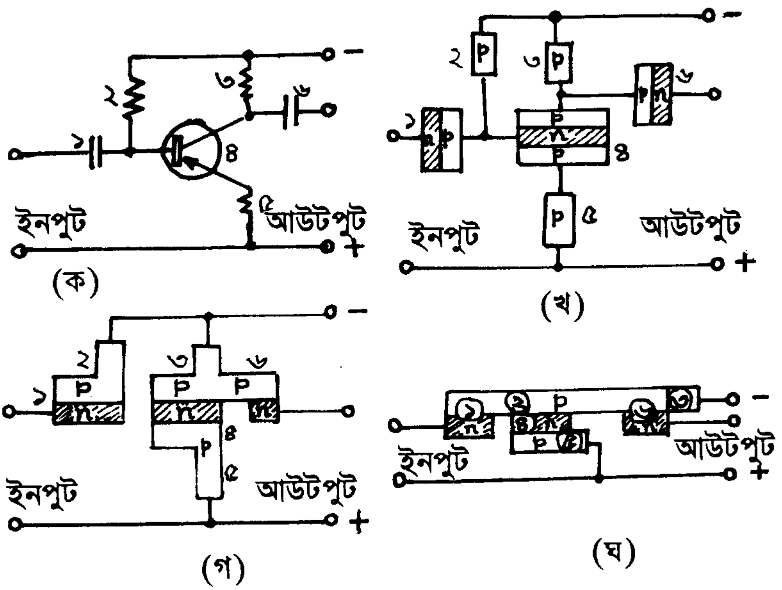

চিত্র ৮·১ একটি ট্রানজিস্টার অ্যামপ্লিফায়ার বর্তনী থেকে অখণ্ড বর্তনীর উদ্ভবের বিভিন্ন স্তর। (ক) আদর্শ বর্তনী ; (খ, গ) মধ্যবর্তী স্তর ; (ঘ) শেষ স্তর।

অতএব উল্লেখিত বিবর্ধক বর্তনী ৮.১ (খ) চিত্রের মতো শুধুমাত্র সিলিকন আর সংযোগকারী তার দিয়ে গঠন করা যায়। একই শ্রেণীর দু'টি সিলিকন অর্ধপরিবাহীর সংযোগের জন্য তারের কোনই প্রয়োজন নেই। এবং তাতে করে বর্তনী আরো সহজতর রূপ নিয়েছে (চিত্র ৮.১ গ)। বর্তনী-উপাদানগুলিকে যদি সুন্দর ও সঠিকভাবে সাজানো হয় তবে বর্তনীটিকে ৮.১ (ঘ) চিত্রের ন্যায় অধিকতর সহজ আঁটসাঁট ও সংক্ষিপ্ত আকারে দেখতে পাওয়া যাবে। সর্বশেষ চিত্রে প্রদর্শিত গঠনটিতে শুধু অর্ধপরিবাহীর চেপ্টা খণ্ড রয়েছে—এখানে শুধু নির্দিষ্ট অংশ কেটে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তুলে ফেলা হয়েছে আর উপযুক্ত বিন্দুতে তড়িদদ্বার বসানো হয়েছে।

একটি প্রচলিত বর্তনী থেকে যে (ঘ) উদ্ভূত হয়েছে তা যদি আমরা ভুলে যাই তবে এটিকে শুধুমাত্র একটি একক অর্ধপরিবাহী সরঞ্জামের মতো মনে হবে। অখণ্ড বর্তনী হিসেবে এটি একটি সম্পূর্ণ বিবর্ধকের কাজ করবে।

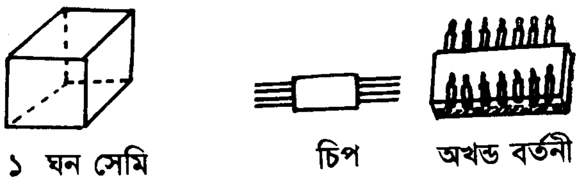

[চিত্র ৮·২ দুটি অখণ্ড বর্তনী ও একটি ১ ঘন সে.মি. কিউবের তুলনা]

এ ধরনের ইলেকট্রনিক্সের আসল উদ্দেশ্য হলো উপাদানগুলি থেকে অখণ্ড বর্তনী পাওয়া এবং কয়েকটি বর্তনীকে একীভূত করে বিশেষ কাজের জন্য একক ইউনিট তৈরি করা। এতে করে প্রতিটি ইউনিট যতদূর সম্ভব ছোট আকারে তৈরির প্রবণতা বাড়ছে ; আর তার ফলে লাভ হচ্ছে যে যতই দিন যাচ্ছে ততই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির আকার–আয়তন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে।

সম্পূর্ণ বিবর্ধক বর্তনী, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটারের অংশসমূহ এ ধরনের একক অর্ধপরিবাহী খণ্ড থেকে তৈরি সম্ভব হয়েছে। একবারে এ ধরনের বহু বর্তনী তৈরি করা হয়ে থাকে।

অখণ্ড বর্তনীসহ একটি সিলিকন চিপের আয়তন সাধারণত প্রায় এক বর্গ মিলিমিটার হয়ে থাকে। বর্তমানে বহু সংখ্যক অখণ্ড বর্তনী–চিপ একীভূত করে এক ধরনের এল. এস. আই (L.S.I বা large scale integration) তৈরি করার ফলে বর্তনী উপাদানের ঘনত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এমন ধরনের ইলেকট্রনিক চিপ তৈরি করা সম্ভব যাতে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে পঁচিশ হাজারের বেশি বর্তনী–উপাদান থাকে। এর ফলে প্রতি উপাদানের খরচও যথেষ্ট কম পড়ে— এখন চিপের প্রতিটি উপাদানের দাম কয়েক পয়সার বেশি নয়। অথচ তুলনামূলকভাবে আলাদা ভাবে উৎপন্ন একটি বর্তনী উপাদানের দাম এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি হয়। কঠিন পদার্থের ইলেকট্রনিক উপাদানের এইরূপ অভাবনীয় উৎকর্ষের জন্য 'মাইক্রো–প্রসেসর'–এর আবির্ভাব ঘটেছে—এগুলি দামেও সস্তা অথচ খুবই কার্যকরী।

প্রাপ্ত তথ্য প্রসেস করে প্রয়োজনমাফিক বিদ্যুৎ-সিগন্যালের সাহায্যে নির্দেশ প্রদান করতে সক্ষম 'সিলিকন চিপ'কে মাইক্রোপ্রসেসর বলা যায়। এদের বহুমুখী কাজকর্ম এমনি পরিধি বিস্তার করে চলেছে যে পাশ্চাত্য জগতে এদের ছাড়া আজকাল সবই অচল। আমাদের দেশেও এদের ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। মাইক্রোপ্রসেসরের কয়েকটি ব্যবহার এখানে আলোচিত হলো।

ডিজিটাল ঘড়ি

আজকাল বাজারে মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল হাতঘড়ি বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। এর ফলে এধরনের ঘড়ির জনপ্রিয়তা দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

সাধারণ হাতঘড়ির চাইতে একটি ডিজিটাল ঘড়ির বিশেষত্ব হলো : (ক) কমসংখ্যক যন্ত্রাংশ থাকায় বেশি নির্ভরযোগ্য, (খ) অনেক বেশি নির্ভূল সময় দেয়, (গ) সময় নির্দেশনা ছাড়াও দিন, তারিখ ও মাস নির্দেশ করে, (ঘ) নির্ভুল 'এলার্ম' ও স্টপ-ওয়াচ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ও (ঙ) ছোট ব্যাটারি দিয়ে বহুবৎসর চলে। মিউজিক বাজানো ছাড়াও অনেক ঘড়িতে নানারকম খেলা এমনকি গল্‌ফ খেলারও ব্যবস্থা আছে।

[চিত্র ৮.৩]

ট্রাফিক লাইট

তোমরা নিশ্চয়ই বড় শহরে ট্রাফিক লাইট দেখে থাকবে এগুলি রাস্তার জাংশনে যান–বাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রথম যখন এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয় তখন এগুলি শুধু 'নির্দিষ্ট সময়' অন্তর অন্তর লাল থেকে সবুজ এবং সবুজ থেকে লাল সংকেত দেখাতো। দিন বা রাত হোক, ভীড় কম বা বেশি হোক তা বিবেচনায় আনা সম্ভব হতো না বলে সংকেত পরিবর্তনের সময় নির্দিষ্ট থাকতো এবং সেভাবেই যানবাহন চলাচল করতো। ফলে জাংশনে কোন বিশেষ দিক থেকে আগত একটিও গাড়ি নেই অথচ ক্রসিং–ইচ্ছুক বহুসংখ্যক যানবাহনকে পুরো ২ মিনিটই সবুজ সংকেতের জন্য অযথা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমাদের দেশে

[চিত্র ৮.৪]

এখনো এ ধরনের 'নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী' ট্রাফিক লাইট প্রচলিত আছে। কিন্তু বিদেশে প্রায় সর্বত্রই আজ মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক লাইট প্রবর্তনের ফলে বড় বড় শহরের যানবাহন চলাচল অনেক সহজ হয়েছে। একটি মাইক্রোপ্রসেসর প্রতিটি রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনের তাৎক্ষণিক হিসাব রাখে এবং জাংশনমুখী বিভিন্ন

পথের যানবাহনের চাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পরিবতে প্রয়োজনানুযায়ী ট্রাফিক লাইটের সংকেত পরিবর্তন করে—ফলে রাস্তায় যানবাহন চলাচলে একটি সুন্দর সুশৃংখল ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়।

আধুনিক মটরগাড়ী

জ্বালানি সাশ্রয়ের কাজে আধুনিক মটরগাড়িতে মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার বেশ কিছুদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে। এই মাইক্রোপ্রসেসর বাইরের আবহাওয়া, ইঞ্জিনের তাপমাত্রা, গাড়ির গতিবেগ ইত্যাদি তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসেস করে এবং বায়ু ও পেট্রোলের মিশ্রণ কখন কি হারে হবে তার তাৎক্ষণিক নির্দেশ সবসময় গাড়ীর জ্বালানি 'ইঞ্জেকসন ইউনিটে' প্রেরণ করে। ফলে গাড়ির গতিবেগের তারতম্য ও আবহাওয়ার বিভিন্নতার মাঝে এই মাইক্রোপ্রসেসর খুবই দক্ষতার সাথে গাড়ির জ্বালানি খরচ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।

ওয়াশিং মেশিন

তোমরা যারা আধুনিক ওয়াশিং মেশিন দেখেছ তারা অনেকেই হয়তো জাননা যে এটি মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম পালনে সক্ষম (programmable) এধরনের ওয়াশিং মেশিনের সুইচ 'অন' করে দিলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা বন্ধ করে দেয়, পানিপ্রবাহের জন্য ভাল্‌ভ খুলে দেয়, পূর্বনির্দেশ মোতাবেক সঠিক তাপমাত্রায় পানি গরম করে এবং ড্রাম ঘূর্ণনকারী মটরের সুইচ সময়মতো 'অন' ও 'অফ' করে দেয়। কোন সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাপড় কাঁচার ও শুকানোর কাজ এ ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রিত ওয়াশিং মেশিনেই সম্ভবপর হচ্ছে।

কয়েনচালিত টেলিফোন

লণ্ডন, নিউইয়র্কের মতো উন্নতদেশসমূহের প্রায় সব শহরেই আজকাল কয়েন-চালিত টেলিফোন বুথ নজরে পড়ে। সাধারণত বিমান বন্দর, রেলস্টেশন, পার্ক বা রাস্তার পার্শ্বে এগুলি দেখা যায়। এসব টেলিফোন মাইক্রোপ্রসেসর-চিপ সজ্জিত থাকে। কত পয়সা টেলিফোন বাক্সে ফেলা হলো, টেলিফোন কলের প্রকৃত খরচ

কত হলো, উদ্বৃত্ত পয়সার পরিমাণই বা কত সব কিছুই মুহূর্তের মধ্যে টেলিফোন সংলগ্ন ছোট্ট পর্দায় ভেসে ওঠে –আবার 'কল' শেষে রিসিভার রাখার সাথে সাথেই উদ্বৃত্ত অর্থ এই প্রসেসরই ফেরত দেয়।

এসব টেলিফোনের কেউ ক্ষতি সাধন করতে চাইলে, কোন অংশ বা সম্পূর্ণ বুথটি তুলে নিয়ে যেতে চাইলে মাইক্রোপ্রসেসরই নিকটস্থ পুলিশকে সাথে সাথে সতর্ক করে দেয় (চিত্র ৮·৬ দ্রষ্টব্য)।

[চিত্র ৮·৫]

ক্যাশ ডিসপেন্সার ঃ বিকল্প ব্যাংক

বিদেশে আজকাল ব্যাংকের পার্শ্বে বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'ক্যাশ ডিসপেন্সার' নামক স্বয়ংক্রিয় বিকল্প ব্যাংক প্রায়ই নজরে পড়। এসব ক্যাশ ডিসপেন্সার মাইক্রোপ্রসেসর সজ্জিত থাকে—রাতদিন ২৪ ঘন্টা এগুলি থেকে টাকা তোলা যায়। এজন্য প্রয়োজন শুধু ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নিজস্ব 'কোড' সম্বলিত একটি কার্ড। এই কার্ড ডিস্পেন্সারের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবেশ করানোর সাথে সাথে একটি পর্দায় নানান তথ্য ভেসে ওঠে—এরপর নির্দিষ্ট নিয়মে বোতাম টিপে কিছু তথ্য সরবরাহ করলেই ইপ্সিত নগদ অর্থ পাওয়া যায়। এবং নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে এই টাকা

ওঠানোর হিসাব সাথে সাথে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। কেউ নিজের একাউন্টের ব্যালান্স বা স্থিতি চাইলে তাও এখান থেকে পাওয়া যায়।

এছাড়া 'সেন্ট্রাল হিটিং' ব্যবস্থাসহ অনেক যন্ত্রপাতিতে মাইক্রোপ্রেসেসরের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স যে আমাদের জীবনযাত্রাকে আধুনিক ও সহজলভ্য করে তুলছে তা' নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রো ও মিনি কম্পিউটারের একটি প্রধান অংগ। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন DEC LSI-11 মাইক্রোকম্পিউটারটি প্রথম বের হয় তখন তা' বাজারের অন্যতম সেরা এবং শক্তিশালী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এ কম্পিউটারের ছোট একটি মাত্র বোর্ডে এক লক্ষ দশ হাজার ট্রানজিস্টার রয়েছে। শুরু থেকে এক দশকের মধ্যে মিনি–কম্পিউটারের দাম চার–পাঁচ গুণ কমেছে অথচ কার্যক্ষমতা পাঁচ ছয়গুণ বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আগেই বলা হয়েছে যে ডিজিটাল ইক্যুপমেন্ট কোম্পানির পিডিপি–৮ কম্পিউটাররর দাম ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৬০০০ পাউণ্ড ছিল তা' ১৯৭৬–এ ১২০০ পাউণ্ড বিক্রি হয়েছে। বর্তমানের এটির দাম আরো হ্রাস পেয়েছে।

আশির দশকের শেষের দিকে বৃটেন, জার্মানি ও ইটালি যৌথভাবে ৫.৮ বর্গ মিলিমিটার (০.০০০০০৫৮ বর্গমিটার) আয়তনের একটি 'মাইক্রো–প্রসেসর' তৈরি করেছে। এই মাইক্রো প্রসেসরটি টর্নেডো বিমানের ডিজিটাল ইঞ্জিন কন্ট্রোল সিস্টেমে প্রথম ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এর পঁচিশ বছর আগে বৃটিশ কোম্পানি 'ফেরান্টি লিমিটেড'–এর তৈরি প্রথম বাণিজ্যিক কম্পিউটারটি ছিল এই মাইক্রো–প্রসেসরের সমান ক্ষমতা সম্পন্ন। আট হাজার ভাল্‌ভ নিয়ে গঠিত এর আয়তন ছিল ৮০ বর্গমিটার অর্থাৎ আয়তনে মাইক্রো–প্রসেসরটির লক্ষ লক্ষ গুণ বড়।

ক্ষুদ্রীকরণের ক্ষেত্রে আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হচ্ছে দীর্ঘ বারো বছরের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এক বৃটিশ কোম্পানি 'সিনক্লিয়ার মাইক্রোভিশন' নামের টেলিভিশন বের করেছে যার পকেট সংস্করণ ১৯৭৮ খ্রিঃ থেকে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া আজকাল বাজারে এমন সব কম্পিউটার পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি হাতে বহন করা যায় অথচ এদের ক্ষমতা একদশক আগের বড় বড় কম্পিউটারের ক্ষমতার সমান।

নয়

সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

'সলিড স্টেট' বা কঠিন পদার্থ বিজ্ঞানের জগৎ যেমন বিশাল তেমনি অবিশ্বাস্য রকমের সম্ভাবনাপূর্ণ—বলা যায় আমরা সে জগতে সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছি। গত পঁচিশ তিরিশ বছরে বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তা' থেকে অনেকেই হয়তো ভেবে বসবে এ বিষয়ে আবিষ্কারের আর তেমন বিশেষ কিছু নেই—সম্ভাব্য সব কিছুই হয়তো আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তা নয়। কারণ আজো বিজ্ঞান মানুষের কাছে তার অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে রেখেছে। তাই নিত্য-নতুন তথ্য ও নব নব ব্যবহারিক প্রয়োগ আজো আবিষ্কৃত হ'য়ে চলেছে। আর আমরাও ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছি। এভাবে এখনো বিজ্ঞানীরা নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার ও উন্নয়ন আর তার সাহায্যে নানাবিধ পরিকল্পনা দিয়ে আমাদেরকে সুন্দর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পদধ্বনি শোনাচ্ছেন।

নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বিষয়টি বেশ আগেই জানা গেলেও অতি সম্প্রতি এর উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলছে। এর ফলে ব্যবহারিক জীবনে অতিবাহিতার প্রয়োগের যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে—তা' যদি অদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী করা সম্ভব হয় তবে সত্যি-সত্যিই প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধিত হবে।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি দিয়ে তৈরি এবং তা কোন শক্তি বা শক্তিসমূহের প্রভাবে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে? পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্নে 'বিগ্‌ব্যাংগ্' বা গগনবিদারী যে শব্দ হয়েছিল, সে সময় কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান না থাকলে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। অকল্পনীয় প্রচণ্ড উত্তাপ ও ঘন অগ্নিবলয় থেকে ১৫০০ কোটি বছর আগে যাবতীয় বস্তুসহ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কণা ত্বরণ যন্ত্র বা এ্যাক্সিলারেটরকে 'সময় যন্ত্র' হিসাবে মনে করা যায়। কারণ এটির সাহায্যে আদিমযুগের অগ্নিবলয়ের মতো ক্ষুদ্রাকৃতি অগ্নিবলয় পুনরায় সৃষ্টি করে পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব। এই যন্ত্রে রিং আকৃতির সুড়ংগ পথে অবস্থিত শক্তিশালী চুম্বকগুলি আহিত কনাসমূহকে বৃত্তাকার পথে পরিচালিত করতে পারে। অসংখ্য বার ঘূর্ণনের ফলে সর্বোচ্চ শক্তি অর্জনের পর কণাসমূহ মুখোমুখী সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকে। এর ফলে অগ্নিবলয়ের সৃষ্টি হবে। এই অগ্নিবলয়গুলি এত ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী যে, সেগুলি এই যন্ত্রের কোন বিপদ বা হুমকির কারণ হয়না। এযন্ত্রে প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি সংঘর্ষ বা বিস্ফোরণের সৃষ্টি হবে।

প্রতি বিস্ফোরণে এক পশলা নতুন বস্তুকণা সৃষ্টি হবে। এসব বস্তুকণা পরীক্ষার মাধ্যমে বহু জটিল তত্ত্বের সমাধান হবে। বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষভাবে নতুন সৃষ্ট বস্তুকণাকে দেখতে পান না। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী কম্পিউটারে রেকর্ড করা সম্ভব।

বর্তমান যুগের কোন ত্বরণযন্ত্রই গগনবিদারী আওয়াজ সংগঠিত হওয়ার পরে আদিমযুগের 'প্রথম সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ' সময়ের পরিবেশ সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট বড় বা শক্তিশালী নয়, যেখানে সবচেয়ে জটিল রহস্যের সূত্র নিহিত আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন করতে এগিয়ে এসেছেন আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানীগণ। এই জটিল অনুসন্ধান কাজে প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিং বা অতিবাহী বস্তু। সুপার কন্ডাকটিং সুপার কলাইডার (এস. এস. সি) নামক পৃথিবীর বৃহদায়তন ও সর্বোচ্চ শক্তিশালী ত্বরণ যন্ত্রের পরিকল্পানা বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে প্রস্তাবিত ৭০০ কোটি ডলার ব্যয়সাপেক্ষে নির্মিত প্রকল্পটি ২০০০ সাল নাগাদ শেষ হবে। এটি তৈরি করতে বিরাটাকায় যুদ্ধ জাহাজের সমান ইস্পাত ও ১০,০০০ চুম্বক দরকার হবে। এতে এত বেশি অতিবাহী তারের প্রয়োজন হবে যা দিয়ে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠকে বিষুবরেখা বরাবর ২৫ বার পরিবেষ্টন করা সম্ভব হবে। অতিবাহী বস্তুর ব্যাপক ব্যবহার সম্বলিত এবং কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয়সাপেক্ষ এই বিপুলায়তন মেশিন তৈরির প্রকৃত যৌক্তিকতা হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতি মূল্য দেয়া আর এর সাফল্যই এনে দিবে মানব সভ্যতার ভাণ্ডারে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও নতুন জ্ঞানের সংযোজন।

BANGLADESH Library Dhaka

কেলাস লেজার-রশ্মি ভবিষ্যতের জন্য অনেক অঙ্গীকার বহন করছে। চিকিৎসা, যোগাযোগ, আলোক-বিজ্ঞান, মহাশূন্য ভ্রমণ, শিল্প-বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বলতে গেলে এর প্রয়োগের কোন সীমারেখা নেই। কিন্তু যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেজারের ব্যবহার আজো সীমাবদ্ধ। তবে অদূর ভবিষ্যতে তা' প্রচুর সম্ভাবনাময় দিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আশাবাদীরা মনে করেন যে বড় ধরনের শক্তিশালী লেজারের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক রূপকথার মতো ডেথ-রে বা মারণ রশ্মি তৈরি করা সম্ভব। এ ধরনের মারণাস্ত্রের সাহায্যে শত্রুপক্ষের হামলার জবাবে তাদের ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, সৈনিক এমনকি মিসাইলের অগ্রভাগকে মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প বা নিশ্চিহ্ন করে ফেলা একদিন হয়ত সম্ভব হবে। তখন হয়ত আমরা অধুনা ব্যবহৃত দামী রাইফেল, মেশিনগান, কামান, এমনকি রাডার, মিসাইল ও নিউক্লিয়ার বোমার কথা বেমালুম ভুলে যেতে পারি। উল্লেখ্য আমেরিকান সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই একটি শক্তিশালী রাসায়নিক লেজার পরীক্ষা করেছে—এর নাম হচ্ছে 'MIRACL' (Mid Infrared Advanced Chemical Laser)। কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী ২×১০^{৬} ওয়াট শক্তি উৎপাদনকারী এই লেজার মিসাইল ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হবে। এর চেয়েও শক্তিশালী পাল্‌স লেজার তৈরি করেছে কার্লিফোর্নিায় অবস্থিত লরেন্স লিভারমোর জাতীয় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। এক সেকেণ্ডের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ স্থায়ী $১০^{১৫}$ ওয়াট শক্তির এই পাল্‌স লেজারের নামকরণ করা হয়েছে NOVA । এই শক্তি ১ লক্ষ নিউক্লীয় চুল্লীর শক্তির সমান। অতিবৃহৎ এই লেজার নিউক্লীয় ফিউশন ও অস্ত্র পরীক্ষার কাজে ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে।

লিথিয়াম নায়োবেট কেলাসের আলোক সম্বন্ধীয় গুণ ভবিষ্যতের কম্পিউটার জগতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করতে যাচ্ছে।

কম্পিউটারের মেমোরি ব্যাংক থাকে তা আমরা সবাই জানি। এখানে বিভিন্ন নির্দেশ, সূত্র, তথ্য প্রভৃতি জমা করে রাখা হয়। মানব মস্তিষ্কেরই একটি ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ এই মেমোরি ব্যাংক। সত্যিকারের একটি জাঁদরেল মেমোরি ব্যাংকে কোটি কোটি তথ্য জমা রাখা যায় এবং দরকার মতো তথ্যের সংশোধন করা যায়। ভবিষ্যতের কম্পিউটারে লেজার রশ্মি ও লিথিয়াম নায়োবেট কেলাসের ব্যবহার হয়তো আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব। এবং তখন অতি অল্প জায়গার মধ্যে

অসংখ্য তথ্য জমা রাখা সম্ভব হবে–যা কিনা আগে কল্পনাও করা যেত না। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অনেক সাফল্যও লাভ করেছেন। একটি তথ্য বহনকারী লেজার রশ্মি যদি নায়োবেট কেলাসের কোন বিন্দুতে পড়ে তবে সে বিন্দুর 'প্রতিসরাঙ্ক' বদলে যায়—আর এর ভিত্তিতেই তথ্য রেকর্ড করা হয়ে থাকে। এখন যদি রশ্মিকে এই কেলাসের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় তবে প্রতিসরাঙ্ক আলাদা আলাদা হওয়াতে এই রশ্মি নির্দিষ্ট দিকে বেঁকে যাবে—আর তার ফলে রেকর্ডকৃত তথ্য পড়া যাবে। রেকর্ডকৃত কোন তথ্য মুছে ফেলতে হলে লেজার দিয়ে তা' করা যায়। আর এ কাজটি বেগুণী লেজার রশ্মি দিয়ে করা হয়—রেকর্ড করার সময় কিন্তু লাল আলো দিয়ে করা হয়। রেকর্ড ক'রে তা আবার মুছে ফেলা—পরীক্ষাগারে পাঁচবার এ ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি করেও দেখা গেছে যে রেকর্ডের গুণাগুণ তাতে নষ্ট হয় না।

আমরা জানি পাম্পিং প্রক্রিয়ায় যে শক্তি ব্যয় হয় তার অনেক কম শক্তিই রুবি কেলাস শোষণ ক'রে লেজার রশ্মি উৎপাদন করে থাকে। দেখা যায় যে এক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ মাত্র। নতুন এক ধরনের SOA লেজার (বা অর্ধপরিবাহী অপটিক্যাল অ্যামপ্লিফায়ার) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এখানে কর্মদক্ষতা আগের তুলনায় ৫/৬ গুণ বেশি। আর এজন্যই শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। আগে সাধারণত এমন সব ক্ষেত্রে লেজার ব্যবহৃত হতো যে কাজের জন্য অন্য পন্থা অচল। কিন্তু সলিডস্টেট লেজার বহু কালের প্রচলিত কলাকৌশলে তার স্থান শীঘ্রই দখল করে নিচ্ছে বলা যায়।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র লেজার হচ্ছে অর্ধপরিবাহী নির্মিত—এগুলি এতই ক্ষুদ্র আকারের যে চোঙাকৃতি এ ধরনের দশটি লেজার একত্রিত করলে মানুষের একটি চুলের ব্যাসের সমান হবে। আমেরিকার 'AT&T বেল গবেষণাগার' ও নিউজার্সির 'বেল যোগাযোগ গবেষণা কেন্দ্রের' সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে এধরনের লেজার। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গবেষকগণ মূলবস্তু গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের উপর গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ও এলুমিনিয়াম আর্সেনাইডের পরপর ছয়শতটি স্তর বসান এবং বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে স্তরগুলিকে ক্ষোদিত (etched) করে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লেজার তৈরিতে সক্ষম হন। এই সব লেজারের

প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৫·৫×১০^{-৬} মিটার এবং প্রস্থ ৩–৫×১০^{-৬} মিটার ; ফলে এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনের একটি চিপে দশলক্ষ লেজারের সংকুলান হয়। সাধারণ একটি অর্ধপরিবাহী লেজারের সাথে এ লেজারের পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে লেজার রশ্মি অর্ধপরিবাহীর প্রান্ত থেকে এবং চিপের সমান্তরালভাবে বের হয়ে আসে। কিন্তু নতুন লেজারে রশ্মি চিপের পৃষ্ঠ থেকে বের হয়। ফলে সাধারণ ইনটিগ্রেটেড বর্তনীর মতোই এই নতুন লেজার তৈরি করা সম্ভব।

এই নতুন লেজারের বৈশিষ্ট্য হলো এগুলিকে সচল করতে খুবই কম বিদ্যুৎ প্রবাহের ($\frac{১}{১০০০}$ অ্যাম্পিয়ার) প্রয়োজন হয়। আর এই বৈশিষ্ট্যই যোগাযোগ ক্ষেত্রে এ ধরনের লেজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করেছে। এছাড়া বুদ্ধিমান কম্পিউটার ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও উন্নতিতে এই লেজার অসামান্য অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রায় দেড় দশক আগে মস্কোর পদার্থবিজ্ঞানী ভিতালী কনোভ লেজার চালিত ক্ষুদ্র মডেল রকেট নিয়ে অনেক সাফল্য লাভ করেছেন। এখানে সুবিধা এই যে রকেট চালানোর জন্য 'ফিউয়েল' বা শক্তি–উৎস পৃথিবীতে থাকবে —ফলে রকেটকে জ্বালানী বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। আর এ ছাড়া এ ধরনের রকেট মুহূর্তের মধ্যে তার পূর্ণ গতি লাভ করবে। এখানে আবহাওয়া দূষিত হবার প্রশ্নও নেই। তবে আসল বড় লেজার রকেট কবে দেখা যাবে তা' শুধু প্রযুক্তিবিদ্যা ও সময়ের উপর নির্ভরশীল।

লেজার রশ্মিকে যানবাহনের দুর্ঘটনা রোধ করার কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা চলছে। কোন মোটরগাড়ি হতে আলোর রশ্মি সম্মুখের গাড়ির দুরত্ব নির্ণয় করবে—এই দূরত্ব নিরাপদ দূরত্বের কম বা সমান হলে তৎক্ষণাৎ একটি ইলেকট্রনিক সঙ্কেতের সৃষ্টি হবে আর তার ফলে ড্রাইভার বুঝার আগেই ব্রেক নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে এই সঙ্কেত পৌঁছবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ি থেমে যাবে।

কঠিন আকৃতির উপাদন আর নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা কম্পিউটার জগতের আমূল পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। এভাবে স্বল্প জায়গায় অধিক তথ্য সংরক্ষণের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। এছাড়া অকল্পনীয় জটিল হিসাব কত দ্রুত করা সম্ভব তাও যেন কল্পনাকে হার মেনে দিচ্ছে। বহনযোগ্য কম্পিউটারের আকার আয়তন দিন দিন

হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯২ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে একটি নতুন খবর বেরিয়েছে। আমেরিকার লাস ভেগাসে EO কোম্পানি কম্‌ডেক্স কম্পিউটার প্রদর্শনীতে Personal Communicator নামে তাদের একটি কম্পিউটার দেখিয়েছে যা কিনা ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এটি আসলে হাতের দুই আঙ্গুলের মধ্যে ধরে রাখা যায় এমন একটি কম্পিউটার। এটিকে ইলেকট্রনিক নোট বইও বলা যায়। সাধারণ কম্পিউটারে যে কী-বোর্ড থাকে তা কিন্তু এখানে নেই। কী বোর্ডের পরিবর্তে একটি 'কলম' দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। 'কলম' ও কম্পিউটার পর্দা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে করে 'কলম' দিয়ে অতিসহজেই তথাকথিত 'ইলেকট্রনিক কালি' দিয়ে পর্দায় লেখা যায়। হাতে লেখা নোট, তথ্য, ছবি বা অন্যকিছুও কম্পিউটারের স্মৃতিতে ধরে রাখা যায়। সাধারণ কম্পিউটারের মতো এখানে যখন তখন ছবি বা তথ্যাবলী সংশোধন এমনকি কাগজে প্রিন্ট করা যায়। এছাড়া লিখিত চিঠি বা ডকুমেন্ট সংযুক্ত ফ্যাক্সের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইচ্ছামতো দূরেও প্রেরণ করা যায়। এটি দশ সেকেণ্ডব্যাপী বক্তব্যও রেকর্ড করতে পারে এবং ইলেকট্রনিক ডাকের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত অনুরূপ Communicator-এ এই বক্তব্য শোনা যেতে পারে। এ ধরনের কম্পিউটারের ওজন ১ কি.গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ২৭·৪, ১৮ ও ২·৩ সে.মি মাত্র। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে আমেরিকায় এবং জুন মাসে ইউরোপে এ ধরনের কম্পিউটারের বিক্রি শুরু হবে। প্রথমে দাম পড়বে দুই হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার ডলার।

'সলিড স্টেট ইন্‌টিগ্রেটেড ইলেকট্রনিক্সের' বদৌলতে আমরা মাইক্রোভিশনের যুগে যাত্রা শুরু করেছি। সময়ের সাথে সাথে এর বিস্ময়কর অবদান আমাদেরকে অনেকদূর নিয়ে যাবে। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন কিনা টেলিভিশন একান্ত ব্যক্তিগতভাবে চশমার আকারে চোখে বা ঘড়ির আকারে হাতে লাগিয়ে ব্যবহার করা যাবে।

পরিশিষ্ট

ভাল্‌ভ

ইলেকট্রন টিউব ভ্যাকুয়াম টিউব নামেও পরিচিত। বৃটিশরা একে বলে 'ভাল্‌ভ'। বলা বাহুল্য এর কার্য-পদ্ধতির বিবেচনায় ভাল্‌ভ শব্দটি ইলেকট্রনিক টিউব শব্দ অপেক্ষা অধিক অর্থবহ।

ডায়োড

ডায়োড বা দ্বি-তড়িদ্‌দ্বার ভাল্‌ভ একটি বায়ুশূন্য কাচের টিউব বা ভাল্‌ভ। এর ভিতরে দু'টি মাত্র তড়িদ্‌দ্বার থাকে (চিত্র পরি-১)। প্রথমটির নাম ক্যাথোড। আর অপরটির নাম অ্যানোড বা প্লেট। এরা উভয়েই ধাতব পদার্থের তৈরি। ক্যাথোড হলো ইলেকট্রনে ঠাসা-গরম করলে এর থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে পড়ে। এ ক্রিয়াকে 'তাপায়নিক নিঃসরণ' বলা হয়। এভাবে ক্যাথোড থেকে টিউবের কেন্দ্রস্থলে ইলেকট্রন প্রেরিত হয়। এর চারদিকে ঘিরে থাকে প্লেট। ক্যাথোডের তুলনায় প্লেটটিকে পজিটিভ বিভবে রাখা হয়। ফলে ক্যাথোড পৃষ্ঠের উত্তপ্ত নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রনগুলি প্লেটের দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ক্যাথোড ও প্লেটের মধ্যে কোন বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ না থাকলেও ক্যাথোড থেকে প্লেটে ইলেকট্রনের এই প্রবাহের দ্বারা বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

ক্যাথোডকে অনেক সময় পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ক্যাথোডের নীচে আলাদাভাবে ফিলামেন্ট রাখা হয়। নিম্ন বিভবের ব্যাটারির সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিয়ে ফিলামেন্ট গরম করে পরোক্ষভাবে ক্যাথোড উত্তপ্ত করা হয়।

যদি কখনও প্লেটের তুলনায় ক্যাথোড পজিটিভ উচ্চ বিভবে থাকে তখন ইলেকট্রন প্লেটের দিকে যেতে পারে না, ফলে প্রবাহ বন্ধ থাকে। কাজেই এটা

পরিষ্কার যে ডায়োড ভাল্‌ভ এমন পরিবাহীর মতো কাজ করে যা' কেবল একই দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে দেয়। এজন্য একে ভাল্‌ভ বা একমুখী কপাট বলা হয়।

ডায়োড ভাল্‌ভ সাধারণত (ক) প্রবাহের একমুখীকরণ, ও (খ) ডিটেকশন বা উদ্‌ঘাটনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ট্রায়োড

ট্রায়োড ভাল্‌ভে তিনটি তড়িদ্‌দ্বার থাকে। ডায়োডের প্লেট ক্যাথোডের শূন্যস্থানে তৃতীয় তড়িদ্‌দ্বার সংস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ডঃ লী ডি ফরেস্ট নামে একজন আমেরিকান ইলেকট্রন টিউবে প্লেট ক্যাথোড ছাড়াও অতিরিক্ত এই তড়িদ্‌দ্বার বা গ্রিড সংযোজন করেন। গ্রিড জাল বা সরু তারের কুণ্ডলীর মতো। এই জাল ইলেকট্রনের গতিকে গভীরভাবে

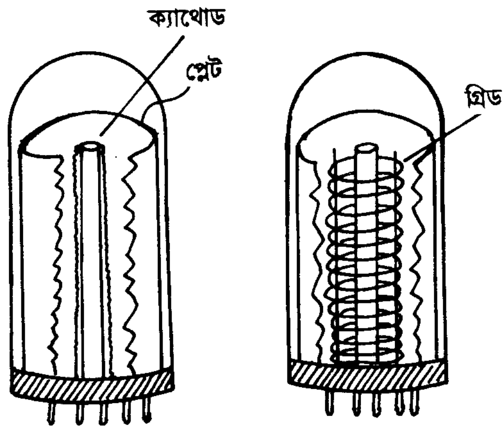

(ক) ডায়োড (খ) ট্রায়োড

[চিত্র : পরি-১]

[চিত্র পরি–১]

প্রভাবিত করে। ফলে গ্রিডের ব্যবহারে ভালভের উপযোগিতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদ্যুতিক সঙ্কেত শক্তিশালী করার জন্য এই ভাল্‌ভ ব্যবহৃত হয়। আগত ক্ষীণ সঙ্কেত বা বৈদ্যুতিক আবেগ গ্রিডের সাথে সংযোগ করতে হয়। গ্রিডে যখন কোন প্রবাহ থাকে না তখন এখানে কোন অতিরিক্ত ইলেকট্রন থাকে না। ফলে ক্যাথোড থেকে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন বাধাহীনভাবে প্লেটে ধাবিত হয়। কিন্তু সঙ্কেতের পজিটিভ বৈদ্যুতিক আবেগের (বিভবের) জন্য গ্রিডের শক্তি ও প্লেটের শক্তি মিলে আরো বেশি ইলেকট্রন আকর্ষণ ক'রে প্রবাহমাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। আর যদি নেগেটিভ চার্জ বা বিভব থাকে তখন ক্যাথোড থেকে প্লেটে ধাবমান ইলেকট্রনগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয় ; ফলে প্রবাহ মাত্রা অনেকগুণ কমে যায়। কাজেই গ্রিড–ক্যাথোডের প্রযুক্ত সঙ্কেত–বিভবের সামান্য পরিবর্তনের জন্য ক্যাথোডে–প্লেট প্রবাহমাত্রার অনেক পরিবর্তন হয়। আর এভাবেই অতিক্ষীণ সঙ্কেতও শক্তিশালী সঙ্কেতে পরিণত হয়।

প্লেটের তুলনায় গ্রিড ক্যাথোডের বেশি নিকটবর্তী বলেই প্লেট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে প্লেটের চেয়ে গ্রিডের কার্যকারিতা অনেক গুণ বেশি। এই ধর্মকে প্রয়োগ করেই ট্রায়োড ভাল্‌ভ অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এভাবে ব্যবহৃত ভাল্‌ভের প্লেট–বর্তনীতে একটি উচ্চমানের রোধক থাকে। এই রোধকের দুই প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত সঙ্কেতই বিবর্ধিত সঙ্কেত।

তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেল

উষ্ণতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন স্কেল বা মাপ রয়েছে যার মধ্যে সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেল এবং তাপমাত্রার পরম স্কেল উল্লেখযোগ্য।

সেন্টিগ্রেট স্কেলে বরফের গলনাঙ্ক 0° এবং পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০° ধরে থার্মোমিটারের মধ্যবর্তী অংশকে সমান ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়। এর প্রতি ভাগকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ($১^\circ C$) বলা হয়।

ফারেনহাইট স্কেলে বরফের গলনাঙ্ক ৩২° এবং পানির স্ফুটনাঙ্ক ২১২° ধরে মধ্যবর্তী অংশকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। এর প্রতি ভাগকে এক ডিগ্রী ফারেনহাইট ($১\ ^\circ F$) বলা হয়।

এই দুই স্কেলের সম্পর্ক ঃ $^\circ C = \frac{৫}{৯}(^\circ F - ৩২^\circ)$।

– ২৭৩ °C কে শূন্য ধরে যে তাপমাত্রা মাপা হয় তাকে পরম তাপমাত্রা বা কেলভিন স্কেল বলা হয়। এই স্কেলে তাপমাত্রাকে ডিগ্রি কেলভিনে (K) প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ঃ

০° C = ২৭৩° + ০° = ২৭৩ K

২০° C = ২৭৩° + ২০° = ২৯৩ K

ঘনত্ব

কোন বস্তুর একক আয়তনের ভরকে বস্তুর ঘনত্ব বলে। আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার বা ঘন ফুট। এক লিটার = ১০০০ ঘন সেন্টিমিটার। অতএব এক মিলিলিটার = ১ ঘন সেমি।

ফ্রিকোয়েন্সি (কম্পনাঙ্ক বা কম্পাংক)ঃ কোন তরঙ্গ (শব্দ, আলোক বা রেডিও তরঙ্গ) এক সেকেণ্ডে যতদূর পথ অগ্রসর হয় তাকে তরঙ্গের গতিবেগ বলা হয়। তরঙ্গের উৎস প্রতি সেকেণ্ডে যতবার কম্পন করে তাকে ঐ তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পনাঙ্ক বলে। এর একক হচ্ছে হার্ৎস (Hz) বা সাইকেল/সেকেণ্ড। আর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য

$$= \frac{\text{গতিবেগ}}{\text{ফ্রিকোয়েন্সি}}$$

চ্যানেল ঃ কেন্দ্র যে ফ্রিকোয়েন্সি সীমায় সঙ্কেত পাঠায় তাকে চ্যানেল বলে।

ওয়াট ঃ বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাপ। বৈদ্যুতিক চাপ ও বিদ্যুৎ-প্রবাহ-মাত্রার গুণফলকে ওয়াট (watt) বলা হয়। সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্‌বের গায়ে কত ওয়াটের বাল্‌ব তা লেখা থাকে। এই সংখ্যা বাতির আলোকদান ক্ষমতা বুঝায়।

অ্যাম্পিয়ার ঃ বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রার একক। কোন তারের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে এক কুলম্ব পরিমাণ চার্জ (অথাৎ $৬{\cdot}২৫\times১০^{১৮}$ টি ইলেকট্রন) প্রবাহিত হলে ঐ তারে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ চলছে বলা হয়।

বিদ্যুৎ-চাপ-পার্থক্য

দু'টি চার্জিত বস্তুর মধ্যে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যের জন্য সংযুক্ত তার দিয়ে একটি হতে অন্যটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই চাপের পার্থক্যকে পটেনশিয়াল

ডিফারেন্স' বা বিদ্যুৎ–চাপ–পার্থক্য বলে। এই পার্থক্য 'ভোল্টে' মাপা হয়। যে বিদুৎ চাপের দরুন এক ওহম রোধকের (পরে দেখ) মধ্যে দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার প্রবাহমাত্রার সৃষ্টি হয়, তাকে 'এক ভোল্ট' বলে। টর্চের জন্য যে 'সেল' বা বিদ্যুৎ–কোষ ব্যবহৃত হয় তার প্রান্তদ্বয়ের বিদ্যুৎ–চাপ পার্থক্য ১.৫ ভোল্ট। ব্যাটারির ধাতুর পাত দু'টির ভিতর এই পার্থক্য 'বিদ্যুৎ চালক বল' হিসেবে কাজ করে।

রোধ

চলার পথে ইলেকট্রন (বিদ্যুৎ–প্রবাহ) ও তারের পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ফলে ইলেকট্রন প্রবাহে যে বাধার সৃষ্টি হয় তাকে তারের 'রেজিস্ট্যান্স' বা রোধ বলা হয়। নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যের জন্য কোন তারের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তা তারের রোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত—এই সম্পর্ক ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

ওহমের সূত্র ঃ $$\frac{\text{বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য}}{\text{প্রবাহ মাত্রা}} = \text{রোধ}$$

এই রোধ মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে 'ওহম' বলে।

রোধতা

এক ঘন সেন্টিমিটার পরিবাহীর বিদ্যুৎ-রোধের পরিমাণকে রোধতা বলে। অর্থাৎ এক সেন্টিমিটার লম্বা ও এক বর্গ সেন্টিমিটার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট পরিবাহীর রোধকে রোধতা বলা হয়। রোধতার একক 'ওহম–সে.মি'।

এ.সি.

যে বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্দিষ্ট সময় পরপর দিক পরিবর্তন করে তাকে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ বা 'এ.সি.' বলে। তারে এ ধরনের বিদ্যুৎ প্রবাহ খুব দ্রুত তালে পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরে পুনরায় সেদিকেই ফিরে আসাকে 'সাইকেল' বলা হয়। বাড়ি–ঘর, অফিস আদালত, কলকারখানায়

যে পরিবর্তী প্রবাহ ব্যবহার করা হয় তা' সেকেণ্ডে ৫০ বার আবর্তিত হয়। এ ধরনের প্রবাহকে বলা হয় ৫০ সাইকেলের এ.সি.।

ডি.সি.

অপর পক্ষে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয় তাকে ডি.সি. (direct current) বলা হয়। টর্চের ব্যাটারি হতে ডি.সি. পাওয়া যায়।

ধারক

দু'টি পরিবাহীকে বায়ু বা অন্য কোন বিদ্যুৎ নিরোধক বস্তু দিয়ে আলাদা ক'রে কাছাকাছি রাখলে তারা বিদ্যুৎ সঞ্চয়কারী হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের সমন্বয়কে 'কনডেন্সার' বা ধারক বলা হয়। এদের চার্জ–ধারণ–ক্ষমতা বা ধারকত্ব পরিবাহীর আকার, আয়তন, পরস্পরের দূরত্ব ও মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। ধারকত্ব মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে 'ফ্যারাড' বলে। এক ফ্যারাডের পরিমাণ অনেক বড় বলে আরো ছোট এককও ব্যবহার করা হয়। যেমন মাইক্রো ($১০^{-৬}$) বা পিকো ($১০^{-১২}$) ফ্যারাড।

কুলম্ব-বল

বিখ্যাত বিজ্ঞানী কুলম্ব চার্জবাহী ক্ষুদ্র গোলক নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে 'দুটি চার্জের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বল (F) উভয় চার্জের গুণফলের আনুপাতিক এবং উভয়ের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের বর্গের ($d^২$) উল্টানুপাতিক'। এই আকর্ষণ বিকর্ষণ বলকে 'কুলম্ব বল' বলে। অর্থাৎ কুলম্ব বল, $F = \frac{Q_১ Q_২}{d^২}$। এখানে $Q_১$ ও Q_2 বায়ুতে অবস্থিত দু'টি চার্জ।

স্বাবেশ

দেখা গেছে যে কোন তারের মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'তে থাকে তখন এর আশেপাশে চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুন চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে তবে চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবেও বিদ্যুৎ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। পরে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল ফারাডে প্রমাণ করেন যে চুম্বক শক্তি দিয়েও

কোন তারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। চুম্বক বা তারকে স্থির অবস্থায় না রেখে যদি একটিকে অপরটির তুলনায় নড়াচড়া করানো হয় তবেই এটি ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বিদ্যুৎ–চুম্বকীয় আবেশ আর এভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহকে আবেশজাত প্রবাহ বলা হয়।

এখন কোন তার বা কুণ্ডলীতে (যেমন রেডিও গ্রাহক যন্ত্রের কুণ্ডলী) যদি এ.সি প্রবাহিত হয় তবে পরিবর্তনশীল প্রবাহের দরুন এই তার বা কুণ্ডলীর আশেপাশে পরিবর্তনশীল চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। আর এ ধরনের পরিবর্তনশীল চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে আবেশজাত 'বিদ্যুৎচালক বল' তথা বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে। এভাবে বিদ্যুৎ চালক বল বা প্রবাহের সৃষ্টি হওয়াকে স্বাবেশ (স্ব + আবেশ) বলে।

অনেক পাকবিশিষ্ট কুণ্ডলীতে শক্তিশালী বিদ্যুৎ চালক বল সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবেশ–জাত এই বিদ্যুৎ প্রবাহের অভিমুখ এমন হয় যে, তা প্রবাহের মূল কারণের প্রতিকূল কাজ করবে ; অর্থাৎ কুণ্ডলীতে প্রবাহ হ্রাস–বৃদ্ধিতে বাধা দিবে বা উল্টো কাজ করবে।

পরিভাষা

অ

অক্ষ	axis
অখণ্ড বর্তনী	integrated circuit
অগ্রবর্তী	forward
অণু	molecule
অণুবীক্ষণ যন্ত্র	microscope
অতিবাহিতা	superconductivity
অতিবাহী	superconductor
অদানাদার কঠিন পদার্থ	amorphous solids
অ-ধাতব	non-metallic
অপদ্রব্য	impurities
অপরিবাহী	non-conductor
অবলোহিত	infra-red
অর্ধপরিবাহী	semiconductor
অ্যানোড	anode

আ

আউটপুট	output
আপতন কোণ	angle of incidence
আয়ন	ion
আলোর সমবর্তন	polarisation of light

ই

ইন্টিগ্রেটেড বর্তনী	integrated circuit
ইনপুট	input
ইলেকট্রন	electron
ইলেকট্রন তরঙ্গ	electron wave

উ

উত্তেজিত	stimulated

এ

একমুখীকারক	rectifier
এক্স-রশ্মি	x-ray

ক

কণিকা	particle
কম্পনাঙ্ক (কম্পাংক)	frequency
কম্পিউটার	computer
কাঠামো	structure
কুণ্ডলী	coil
কুপরিবাহী	bad conductor
কেলাস	crystal
কেলাসিত কঠিন পদার্থ	crystalline solids

BANSDOC Library
Accession No. 18449
BANSDOC Library

ক্যাথোড	cathode
ক্ষেপণাস্ত্র	missile
ক্ষোদিত	etched

গ

গতিবেগ	velocity
গলনাঙ্ক	melting point
গ্রাহক এরিয়েল	receiving aerial
গ্রাহক কেন্দ্র	receiving centre
গ্রাহক বর্তনী	receiving circuit
গ্রিড	grid

ঘ

ঘনক	cube
ঘনত্ব	density

চ

চার্জযুক্ত (আহিত)	charged
চিপ	chip
চুম্বকধর্মী	magnetic
চৌম্বক ক্ষেত্র	magnetic field
চ্যানেল	channel

ট

টেলিভিশন	television
ট্রানজিস্টার	transistor
ট্রায়োড	triode

ড

ডায়োড	diode

ত

তল	plane
তাপমাত্রা	temperature
তাপায়নিক	thermionic
তৈরী	fabricate
তির্যক তরঙ্গ	transverse wave
তীব্রতা	intensity

দ

দ্বিরাগত্ব ধর্ম	dichroism

ধ

ধাতু	metal
ধারক	condenser
ধারকত্ব	capacity
ধ্রুব	constant

ন

নিউক্লিয়াস	nucleus
নিউট্রন	neutron
নিষ্ক্রিয় গ্যাস	inert gss
নিঃসরণ	emission
নিঃসারক	emitter

প

পরমাণু	atom
পরিবর্তী প্রবাহ	alternating current
পরিবর্ধক	amplifier
পরিবর্ধিত	amplified
পরিবাহী	conductor

পশ্চাদবর্তী প্রবাহ	reverse current
পশ্চাদমুখী স্পর্শ বিভব	reverse contact potential
পাইরো-ইলেকট্রিক	pyroelectric
পাঈজো-ইলেকট্রিক	piezoelectric
প্রতিসরণ কোণ	angle of refraction
প্রতিসরাঙ্ক	refractive index (co-efficient of refraction)
প্রসারণাঙ্ক	co-efficient of expansion
প্রেরক এরিয়েল	transmitting aerial
প্রেরক বর্তনী	transmitting circuit
প্রেরণ কেন্দ্র	transmitting centre

ফ

ফিলামেন্ট	filament
ফ্রিকোয়েন্সি সীমা	frequency band
ফোটন	photon

ব

বর্তনী	circuit
বিকিরণ	radiation
বিকীর্ণ	radiated
বিদারণ	cleavage
বিদ্যুৎ-চাপ পার্থক্য	potential difference
বিদ্যুৎ-চালক বল	voltage
বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ	neutral
বিদ্যুৎ-প্রবাহ	electric current
বিবর্ধক	amplifier
বিভব	potential
বিভব প্রাচীর	potential barrier
বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক	electric brain
ব্যাতিচার	interference
ব্যাসার্ধ	radius

ভ

ভূমি	base

ম

মৌলিক কণিকা	fundamental particles
মৌলিক পদার্থ	element

য

যোজনী	valency
যোজনী ইলেকট্রন	valence electron
যৌগিক পদার্থ	compound

র

রশ্মি-বন্দুক	ray-gun
রাডার	radar
রাসায়নিক বিক্রিয়া	chemical reaction
রোধতা	resistance

ল

লেজার	laser
ল্যাটিস	lattice

শ

শক্তি স্তর	energy level

স

সংগ্রাহক	collector
সংকট তাপমাত্রা	critical temperature
সঞ্চয়ী ব্যাটারী	accumulator
সমন্বিত বর্তনী	integrated circuit
সাইকেল	cycle
সুপরিবাহী	good conductor
সুসঙ্গত	coherent
সৌর কোষ	solar cell
স্থিতিস্থাপকতা	elasticity
স্ফুটনাঙ্ক	boiling point

হ

হিমায়ন	refrigeration
হীরক	diamond